অপরূপ রূপকথা

বুদ্ধদেব বসু

হান্স আন্ডেরসেনের তেরোটি গল্পের অনুবাদ

অপরূপ রূপকথা

বুদ্ধদেব বসু

অবসর

bengaliboi.com

বাংলাদেশ
প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৩
পুনর্মুদ্রণ : এপ্রিল ২০০৭
পুনর্মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০১২

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
দীপক রায়

অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা–১১০০'র পক্ষে
এফ. রহমান কর্তৃক প্রকাশিত এবং নিউ পুবালি মুদ্রায়ণ, ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড
সূত্রাপুর, ঢাকা–১১০০ কর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য : ৯০.০০ টাকা মাত্র

Aparoop Roopkatha : A Collection of Fairy Tales by Buddadeva Bose.
Published by ABOSAR. 46/1 Hemendra Das Road, Sutrapur, Dhaka-1100
Reprint : February 2012. Price : Taka 90.00 Only.

একমাত্র পরিবেশক : প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা
বিক্রয়কেন্দ্র : ৩৮/২ক বাংলাবাজার (দোতলা), ঢাকা–১১০০

যোগাযোগ
ফোন : ৭১১৫৩৮৬, ৭১২৫৫৩৩
e-mail : protikbooks@yahoo.com, abosarprokashoni@yahoo.com, protik77@aitlbd.net

অপরূপ রূপকথা

কুৎসিতহাঁস/১
কোকিল ও কলের কোকিল/১১
রুটি মাড়িয়ো না/২১
আঙুলিনা/৩০
ঠাণ্ডা দেশের পণ্ডিত/৪১
লাটিম ও বল/৫৪
রাজার নতুন পোষাক/৫৮
দেশলাইয়ের বাক্স/৬৩
লাল জুতো/৬৭
ছোটো-কালু বড়ো-কালু/৭৪
এক খোসায় পাঁচজন/৮৬
রাজকন্যা ও মটরশুঁটি/৯১
ছোট্ট জলকন্যা/৯৩

পরিশিষ্ট

হান্স অ্যান্ডেরসেন
দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

bengaliboi.com

bengaliboi.com

বাংলাদেশ সংস্করণ : প্রকাশকের কথা

আমরা আনন্দিত ও গর্বিত যে বাংলাদেশ থেকে বুদ্ধদেব বসুর 'অপরূপ রূপকথা' বের করতে পারলাম। বুদ্ধদেব বসু তাঁর জাদুকরী ভাষায় ছোটদের জন্য লিখেছেন অনেক। অনুমতি পেলে সব কটি বই বাংলাদেশের কিশোর কিশোরীদের জন্য বের করার ইচ্ছে রাখি।

তবে একটা কথা বলা খুবই জরুরি। বুদ্ধদেব বসুর যেমন নিজস্ব গদ্যরীতি রয়েছে, তেমন বানানের ক্ষেত্রেও তিনি তাঁর লেখকজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে নিজস্ব বানান প্রশ্রয় দিয়েছেন। আর এদিকে বাংলাদেশে কিশোরপাঠ্য বইয়ের বানানে সমতা আনার নিয়ম চালু হয়েছে। বিজ্ঞজনেরা বলেছেন এটাই হওয়া উচিত। তাই আমরা এখানে সম্পাদিত বানান রীতিতেই 'অপরূপ রূপকথা' গ্রন্থের বাংলাদেশ সংস্করণ মুদ্রিত করলাম।

বইটি বাংলাদেশ থেকে প্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন স্বনামধন্য লেখিকা ও কবি–পত্নী শ্রদ্ধেয়া প্রতিভা বসু। আর এই যোগসূত্র রচনা করে দিয়েছেন আমাদের সকলের সুহৃদ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুবীর রায়চৌধুরী। আমরা সকলের কাছেই চিরকৃতজ্ঞ।

কুৎসিত
হাঁস

শহর ছাড়িয়ে যেখানে পাড়াগাঁ, সেখানে সবই সুন্দর, কেননা সেখানে শরৎ এসেছে, যদিও কখন এসেছে কেউ জানে না। মাঠভরা সবুজ ঘাস, খেতভরা হলদে ধান ; আর মাঠের ফাঁকে ফাঁকে খড়ের গাদা উঁচু করা, আর সারসপাখি তার লম্বা লাল পা ফেলে-ফেলে বেড়াচ্ছে, আর আরবিতে বকর-ক্কর করছে, যেহেতু তার মা আর-কোনো ভাষা তাকে শেখায় নি। মাঠের চারদিকে মস্ত ঘন বন, আর সেই বনে মস্ত-মস্ত গভীর হ্রদ। সত্যি, সবই সুন্দর। আকাশ-ভরা রোদ, আর সেই রোদে একটা ভাঙা ছাড়া বাড়ি, বাড়িটার চারদিকে সরু-সরু খাল। জায়গাটার জংলা চেহারা, বনের মতোই। আর সেখানে—সেখানে বসে আছে একটা পাতিহাঁস।

কেন বসে আছে? তার ডিমের তা দিতে হচ্ছে যে! বাচ্চাগুলো ফুটতে বড়ো দেরি করছে, তার বিরক্ত লেগে উঠছিল। এ পোড়া জায়গায় কথা বলবার একটা লোকও নেই। অন্য হাঁসেরা মনের ফুর্তিতে খালে-খালে গুরে বেড়াচ্ছে, কার অত গরজ তার সঙ্গে দু'দণ্ড বসে কথা বলবে।

শেষটায় ডিমগুলো এক এক করে ফুটতে লাগল। পি-পি, পি-পি-পি! ডিমের খোলশ ভেঙে ছোট্ট বাচ্চারা মাথা বার করে দিয়েছে।

'প্যাঁক! প্যাঁক!'

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল তারা, সবুজ পাতার নিচে চারদিকের যতটা পারলে দেখে নিলে। বললে, 'প্যাঁক! প্যাঁক!' ওদের মা বললে, 'দ্যাখ, দ্যাখ।' ওরা যতটা পারে দেখে নিক, সবুজ রং চোখের পক্ষে ভালো।

'বাপরে, কী মস্ত পৃথিবী!' ছোটো বাচ্চারা বলে উঠল। কেননা ডিমের মধ্যে যতটা জায়গা তাদের ছিল এখন তার চেয়ে ঢের বেশি নিশ্চয়ই।

'সর্বনাশ!' তাদের মা বললে, 'তোরা বুঝি ভেবেছিস এইটুকুই সমস্তটা পৃথিবী? এই খেত পেরিয়ে, ঐ মাঠ ছাড়িয়ে এক্কেবারে ও-ই ধূ-ধূ বাগান পর্যন্ত যে! সে পর্যন্ত আমিই কখনো যাই নি। তোরা সবাই ঠিকঠাক আছিস তো?' বলে হাঁসটা উঠে দাঁড়াল। 'সর্বনাশ!' (হাঁসটার কথায় কথায় 'সর্বনাশ' বলবার অভ্যেস ছিল) 'এখনো এই মস্ত বেঢপ ডিমটা তো ফোটে নি! কী জ্বালা—এটা আর কতক্ষণ টিকবে! আর তো পারিনে—' বলতে-বলতে সে সেই মস্ত বেঢপ ডিমটার উপর ফের বসে পড়ল।

'কী গো, কী খবর?'

বুড়ি হাঁসটা বেড়াতে এসেছে। বুড়ি বড়ো ভালো, ঘুরে-ঘুরে পাড়া-পড়শিদের খোঁজ-খবর নিয়ে যায়।

'কী আর বলব—যা মুশকিলে পড়েছি এই একটা ডিম নিয়ে! কিছুতেই ও ফুটবে না! এই এদের একবার দেখুন না—বাছারা আমার ফুটফুট করছে। অবিকল ওদের বাপের মতো হয়েছে—তা ও-হতভাগা তো একবার দেখতেও আসে না আমাকে।'

'দেখি, দেখি একবার এই ডিমচন্দ্রকে! হুঁ-হুঁ, কেমন ঠেকছে যেন—বন-মুরগির আণ্ডা কিনা কে জানে! একবার আমার যা বিপদ হয়েছিল—এক কিল্লি

বন-মুরগিকে তো তা দিয়ে-দিয়ে ফোটালুম। আর বোলো না—সে বিশ্রী জোচ্চোরি কাণ্ড! কম ভুগিয়েছে আমাকে! দস্যিরা কিছুতেই জলে যাবে না—যত বোঝাই, যত পড়াই, যত শেখাই, ভয়েই মরে। দেখো এটা যেন আবার সেই রকম না হয়। ওটা থাক পড়ে—তুমি বাচ্চাদের সাঁতার কাটতে শেখাও বরঞ্চ।'

'আর-একটু বসে দেখি', মা-হাঁস বললে। 'এতই বসতে পারলুম, আর দুচার-দিনে কী আর হবে।'

'করো তোমার যা খুশি', বলে বুড়ি চলে গেলো।

শেষটায় প্রকাণ্ড ডিমটা ফুটল। 'পিঁ-পিঁ!' বলে বাচ্চা এল বেরিয়ে। বাচ্চাটা মস্ত বড়ো, আর দেখতে অতি কুচ্ছিৎ। মা-হাঁস তার দিকে তাকাল।

'সর্বনাশ! এ যে দেখছি মস্ত! আর-কারো মতোই তো ও দেখতে হয় নি। তবে কি সত্যি একটা বন-মুরগি ফোটালুম? জলে গেলেই বোঝা যাবে। জলে ওকে যেতেই হবে—যেতে না-চায় আমি নিজে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেব।'

পরের দিনটিও চমৎকার, গাছের পাতায়-পাতায় রোদ ঝরে পড়ছে। মা-হাঁস গেল বাচ্চাদের নিয়ে জলের ধারে। ঝুপ্ করে সে লাফিয়ে পড়ল, তারপর ডাক দিলে, 'প্যাঁক-প্যাঁক!' সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চারা ঝাঁপিয়ে পড়ল। জলের নিচে তাদের মাথা ডুবে গিয়ে একটু পরেই আবার উঠে এল। জলে ভাসছে তারা, চমৎকার সাঁৎরাচ্ছে, পাগুলো নিজে থেকেই চলছে যেন। ছাই-রঙের কুচ্ছিৎ বাচ্চাটাও আছে সকলের সঙ্গে।

'বাঁচা গেল, ওটা বন-মুরগি নয় তাহলে! বেশ তো সাঁৎরাচ্ছে ও, দিব্যি মাথা খাড়া করে। ঠিকমতো দেখলে এমন কুচ্ছিৎই-বা কী? বেশ তো সুন্দর। প্যাঁক! প্যাঁক! চলে এসো সবাই আমার সঙ্গে; চলো, পৃথিবীটা তোমাদের দেখিয়ে আনি। ওই তো দেখছ হাঁসেদের উঠোন, সবার সঙ্গে আলাপ করবে, এসো। আমার সঙ্গে-সঙ্গেই এসো, কেউ যেন মাড়িয়ে না-দেয়। আর ঐ লক্ষ্মীছাড়া বেড়ালগুলোকে সাবধান!'

উঠোনে তখন হুলুস্থুল কাণ্ড। তুমুল ঝগড়া চলছে দুই শরিকে একটা মাছের মুড়ো নিয়ে। শেষ পর্যন্ত চোর বেড়ালের কপালেই সেটা জুটে গেলো।

'দেখো পৃথিবীর এইরকম কাণ্ড', বলে মা-হাঁস জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল, কেননা মাছের মুড়োর উপর তার লোভও বড়ো কম নয়। 'পা চালাতে শেখ, পা চালাতে শেখ। ছটফট করে চলতে না-পারলে আর হাঁসের বাচ্চা কী! ওই বুড়িকে প্রণাম করতে ভুলো না বাছারা। আমাদের মধ্যে উনিই মস্ত মাৎবর—ইরান রক্ত আছে ওঁর গায়ে, কী-রকম মোটা দেখছ না! আর ওই যে ওঁর পায়ে জড়ানো লাল একটা ন্যাকড়া দেখছ, আমাদের মধ্যে এর চেয়ে বড়ো সম্মান আর হয় না। এর জন্যে হাঁস তো হাঁস, মানুষ পর্যন্ত ওঁকে খাতির করে। গা-ঝাড়া দাও বাছারা, আর হ্যাঁ,

পায়ের আঙুল গুটিয়ো না—ভালো ঘরের হাঁস জন্ম থেকেই পায়ের আঙুল ছড়াতে শেখে—বাপ-মায়েরই মত—এই যে, এই রকম। এখন ঘাড় বাঁকিয়ে বল, "প্যাঁক"!'

বাচ্চারা তা-ই করলে, দিব্যি ফুটফুটে চটপটে ঝাঁক। কিন্তু হলে কী হবে, আশেপাশের হাঁসের দল কিছুমাত্র লুকোছাপা না-করে বললে :

'দেখো কাণ্ডটা! এমনিতেই পা ফেলবার জায়গা নেই, তার মধ্যে এগুলো সব ঘুরে-ঘুরে জায়গা জুড়ে বেড়াবে তো! আর ওই বাচ্চাটা যা কুৎসিত দেখতে—ছি! আর-সব সয় বলে এ-ও সইবে নাকি?' একটা হাঁস তক্ষুনি উড়ে গিয়ে কুৎসিত বাচ্চার ঘাড়ে দিলে কামড়ে।

'কেন ওকে জ্বালাচ্ছ?' মা-হাঁস বলে উঠলা। 'ও তো কারো পিছনে লাগতে যাচ্ছে না!'

'কী বিশ্রী বে-আন্দাজি চেহারা ওর! ওটাকে আমরা তাড়িয়ে ছাড়ব!'

পায়ে লাল ন্যাকড়া জড়ানো মোড়ল বুড়ি এতক্ষণে বললে, 'বাছা, তোমার ছেলেপুলেরা সবাই তো দেখতে ভালো, ওটা কেন ও-রকম হলো? ওকে এখন বদলে নিতে পারো না?'

'তা কী করে হবে দিদি', মা-হাঁস কাঁচুমাচু মুখে বললে। 'আমরা পাতিহাঁসরা রূপের জন্যে বিখ্যাত বলেই তো ওকে কুৎসিত ঠেকছে—নয় তো মুরগি ইত্যাদি বেজাত পাখির তুলনায় ও তো দস্তুরমতো সুপুরুষ! তা সুন্দর না-ই বা হল, ওর স্বভাবটা ভারি ভালো, অন্যদের মতোই সাঁৎরায়—অন্যদের চেয়েও ভালো সাঁৎরায়। ডিমের মধ্যে খুব বেশি দিন ছিল কিনা, তাই এখন একটু অদ্ভুত দেখছেন, বড়ো হলেই শুধরে যাবে।' বাচ্চাটার ঘাড়ে চিমটি কেটে-কেটে পালকগুলো সাফ করে দিলে। 'আর ব্যাটাছেলের রূপ দিয়ে আর কী হবে, বলুন! এখনই যে-রকম ভাব দেখছি ওর, ও একটা হাঁসের মতো হাঁস হবে।'

বুড়ি বললে, 'তোমার ছেলেপুলেরা অন্য সবাই তো বেশ সুশ্রী। যাই হোক, থাকো তোমরা এখানে, আর দেখো তো খুঁজে, আমার জন্যে একটা মাছের মুড়ো যোগাড় করতে পারো কিনা!'

এই তাদের বাড়ি। বাচ্চারা হেসে-খেলে বেড়াতে লাগল কিন্তু সে কুৎসিত বাচ্চা, সবার শেষে যে ডিম থেকে বেরিয়েছিল—তাকে সবাই দুয়ো দেয়, ধাক্কা দেয়, কামড়ে দেয়। হাঁসেরা তো দেয়ই, মুরগিরাও ছাড়ে না। সবাই একসঙ্গে বলে, 'বড়ো কী-আন্দাজ দেখো না!'

'বেঢপ কোঁৎকা কোথাকার', বলে এক জবরদস্ত মুরগি তাকে তাড়া করে এল। মুরগি জাতটাই বেজায় দেমাকি, তার উপর ইনি নিজেকে একেবারে নবাব বাদশা মনে করেন। হাঁসেরা যে মনে-মনে মুরগিদের ছোটো জাত মনে করে সে-রাগটাও আছে। বড়ো-বড়ো নিশ্বাস ফেলে ইনি নিজেকে পাল-তোলা নৌকার মতো ফুলিয়ে তুললেন, কয়েক বার মাথা নেড়ে-নেড়ে ঢোক গিললেন, লাল হয়ে উঠল মুখ।

বেচারা বাচ্চা তো ভয়েই জড়োসড়ো ; কোনদিকে তাকাবে, বসবে না দাঁড়াবে, কিছু ঠিক করতে পারলে না। সে কুৎসিত, কেউ তাকে দেখতে পারে না—মনটা বড়ো খারাপ হয়ে গেল তার।

প্রথম দিন থেকে সেই যে শুরু হল, বেচারার অবস্থা আরো খারাপ হয়ে উঠতে লাগল দিন-দিন। তাকে দেখলেই সবাই দূর-দূর করে, তেড়ে মারতে আসে ; তার ভাই-বোনেরা পর্যন্ত চটে গিয়ে বলে, 'বেড়ালেও তোকে চোখে দেখে না, অলক্ষুনে!' আর মা বলেন, 'ওটা দূরে চলে গেলেও বাঁচতুম।' আর হাঁসেরা ওকে কামড়ায় আর মুরগিরা ওকে খোঁচায়, আর যে-মেয়েটা রোজ তাদের খাওয়াতে আসে, সে তো একদিন ওর গায়ে লাথি দিয়েই চলে গেল।

তখন ও ছুটে উড়ে চলে গেল বেড়া পার হয়ে, ঝোপের পাখিরা ভয় পেয়ে উড়ে পালাল।

'আমি কুৎসিত বলেই ওরা অমন করে পালাল,' ও ভাবলে। তারপর চোখ বুজল, চোখ বুজে উড়ে গেল আরো অনেক দূরে, উড়তে-উড়তে এসে পড়ল মস্ত একটা বিলে, যেখানে বুনো হাঁসের বাসা। এখানে সে শুয়ে রইল সমস্ত রাত—ক্লান্ত সে, মন তার একেবারেই ভালো নেই।

ভোরের দিকে উড়ে এল দুটো বুনো হাঁস, তাদের এই নতুন সঙ্গীটির দিকে তাকাল।

'কেমন পাখি হে তুমি?' লজ্জায় যতটা পারল মুখ ঢেকে রইল বেচারা। 'তুমি তো দেখছি ভারি কুৎসিত! তা তাতে আমাদের কিছু এসে যায় না—আমাদের ঘরের কোনো মেয়েকে বিয়ে না-করলেই হল।'

বেচারা! বিয়ে করবার কথা সে যেন কতই ভাবছে! বাঁশের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে শুয়ে থাকবে, আর একটু-একটু করে জল খাবে, এর বেশি কিছুই আশা করে না সে।

এমনি করে পুরো দুটো দিন সে শুয়ে রইল ; তারপর সেখানে এল আরো দুটো বুনো হাঁস। অল্প বয়েস তাদের, ডিম থেকে বেরিয়েছে বেশি দিন হয় নি। অমন চটপটে ফুর্তিবাজ সেইজন্যেই।

তাদের একজন বললে, 'শোনো, তুমি দেখতে এত বিশ্রী যে তোমাকে আমার ভালোই লাগছে। এসো না আমাদের সঙ্গে উড়ে বেড়াবে। খবর পেয়েছি কাছেই আর-একটা বিলে কয়েকটি বুনো হাঁসের মেয়ে বড়ো হচ্ছে—ভারি সুন্দর তারা, দস্তুরমতো প্যাঁকপ্যাঁক করতে পারে—এখনো কারো বিয়ে হয় নি। হলেই বা কুৎসিত, হয়তো সেখানে তোমার কপাল খুলে যেতে পারে।'

'গুম! গুম!' হঠাৎ একটা শব্দে বাতাস কেঁপে উঠল, সঙ্গে-সঙ্গে বুনো হাঁস দুটো মরে জলে পড়ে গেল—টুকটুকে লাল হয়ে উঠল জল। 'গুম! গুম!' আবার শব্দ হল, আর ঝাঁকে-ঝাঁকে হাঁস উড়ে এল বাঁশ-বনের বুকের ভিতর থেকে। তারপর

আবার শব্দ হল। মস্ত শিকার চলছে। শিকারীরা চারদিকে ওঁৎ পেতে রয়েছে, কেউবা বসে রয়েছে গাছের ডালে, নোয়ানো বাঁশ ছড়িয়ে যা অনেক উঁচুতে উঠেছে। গাছের আবছায়ার ভিতর দিয়ে নীল ধোঁয়া উঠছে মেঘের মতো, উড়ছে জলের উপর দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত। জলের উপর দিয়ে শিকারী কুকুরগুলো এলো ছলছল শব্দ করতে-করতে, জলের নিচেকার সব গাছপালা থরথর করে কেঁপে উঠল। কী ভয়ই পেল বেচারা! তাড়াতাড়ি পাখার মধ্যে মুখ লুকোল, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে মস্ত একটা ভয়ংকর কুকুর একেবারে ওর কাছে এসে দাঁড়াল। লাল লকলকে তার জিভ ঝুলে পড়েছে, ভীষণ হিংস্র দুটো চোখ চকচক করছে। সে একবার ওর গায়ের সঙ্গে প্রায় নাক লাগাল, একবার দাঁত বার করল—তারপর ছলছল করতে করতে চলে গেল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও বললে, 'ঈশ্বরের দয়া! আমি এতই কুৎসিত যে আমাকে কামড়াতে কুকুরটার পর্যন্ত ইচ্ছে করে না।'

চুপ করে মুখ থুবড়ে পড়ে রইল। বাঁশ-বন কাঁপিয়ে-কাঁপিয়ে থেকে থেকে বন্দুকের আওয়াজ বেজে উঠছে। বিকেলের দিকে আওয়াজ থামল, কিন্তু তবু বেচারার উঠতে সাহস হল না। আরো অনেকক্ষণ নিঃসাড় হয়ে শুয়ে রইল সে, তারপর চারদিকে একবার তাকিয়েই উড়ে চলল,—পাখায় তার যত জোর আছে। গেল বিল ছাড়িয়ে, গেল মাঠ ছাড়িয়ে, বন ছাড়িয়ে—হঠাৎ এমন একটা ঝড় উঠল যে এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় যাওয়াই মুশকিল।

সন্ধের দিকে সে এসে পৌঁছল এক চাষার ছোট্ট কুঁড়ে ঘরে। ঘরটা এমনই ভাঙাচোরা যে সেটা যেন বুঝে উঠতে পারছে না কোনদিকে পড়বে, আর সেইজন্যেই দাঁড়িয়ে আছে। ঝড়ের ঝাপট এত জোরে এসে লাগছে যে বেচারা আর চলতে পারে না। সে বসে পড়ল, এদিকে ঝড় যেন ক্রমশ বেড়েই চলেছে। কখন সে লক্ষ করলে যে ঘরের দরজার একটা কবাট আলগা, ইচ্ছে করলেই ফাঁক দিয়ে সে ঢুকে পড়তে পারে।

তা-ই করলে সে।

কুঁড়ে ঘরে থাকে এক বুড়ি, সঙ্গে থাকে একটা বেড়াল, আর থাকে একটা মুরগি। বেড়ালকে বুড়ি ডাকে সোনা বলে ; সে পিঠ বাঁকা করে গোঁফ ফুলিয়ে গোঁ-গোঁ করে পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করলে ফুলকিও বার করতে পারে চোখ দিয়ে। মুরগিটার ছোটো-ছোটো খাটো-খাটো পা, সেইজন্যে তার নাম হয়েছে চিকিচিকি-খাটো-পা। সে খুব ভালো-ভালো ডিম পাড়ে, বুড়ি তাকে ভালোবাসে নিজের মেয়ের মতো।

হাঁস বেচারা ঘরের কোণে লুকিয়ে রাতটা কোনোরকমে কাটিয়ে দিলে, কিন্তু ভোর হতেই সে ধরা পড়ল। অমনি বেড়াল উঠল গোঁ-গোঁ করে, মুরগি খাটো-খাটো পা ফেলে-ফেলে খ্যাঁক-খ্যাঁক করে উঠল।

'কী? কী?' বুড়ি তাড়াতাড়ি ছুটে এসে চারদিকে তাকাতে লাগল। কিন্তু চোখে সে ভালো দেখত না বলে বেঢপ বাচ্চাকে সে মনে করল মোটাসোটা বড়োসড়ো একটা

হাঁস বুঝি। খুশি হয়ে বললে, 'বাঃ! খুব একটা পাওয়া গেছে তো। রোজ এখন হাঁসের ডিম খাব। ব্যাটাছেলে না হলেই বাঁচি, সেটা আগে দেখে নিতে হবে।'

হাঁসের পরীক্ষা চলল তিন সপ্তাহ। হায়রে, ডিমের দেখা নেই। বেড়াল হচ্ছেন বাড়ির কর্তা, আর মুরগি হচ্ছেন গিন্নি, আর তাঁর মুখে সব সময়েই লেগে আছে, 'আমরা আর এই পৃথিবী!' কেননা বেড়ালের ধারণা তাঁরা দু'জন হচ্ছেন পৃথিবীর আদ্ধেক, আর সে-আদ্ধেক অন্য অর্ধেকের চেয়ে ভালো। হাঁস বলতে চায় এ-বিষয়ে অন্য রকম মতও থাকতে পারে, কিন্তু মুরগি সে-কথা কানেই তুলবে না।

'ডিম পাড়তে পারিস তুই?'

'না।'

'তাহলে দয়া করে আপনি চুপ করে থাকুন!'

বললে বেড়াল :

'পারিস আমার মতো পিঠ বাঁকা করতে, গোঁ-গোঁ আওয়াজ করতে, চোখ দিয়ে ফুলকি বার করতে?'

'না।'

'তাহলে তোমার চাইতে যারা বেশি বোঝে তাদের কথার উপর কথা বলতে এসো না।'

হাঁস আর কথা বললে না, কোণে গিয়ে বসলো মন-খারাপ করে, আর তখনই ঘরে এসে ঢুকল বাইরের আলো আর হাওয়া, আর সঙ্গে-সঙ্গে তার মন জলে সাঁৎরাবার জন্যে এমন অদ্ভুত ব্যাকুল হয়ে উঠল যে কথাটা সে মুরগিকে না-বলে পারলে না।

'পাগল নাকি?' মুরগি খেঁকিয়ে উঠল। 'কোনো কাজ নেই কিনা, বসে-বসে তাই রাজ্যের বাজে কথা ভাবো। ডিম পাড়তে শেখো কি শেখো গোঁ-গোঁ আওয়াজ করতে—তাহলে এ-সব কেটে যাবে।'

'জলে সাঁৎরাতে কী মজাই যে লাগে', হাঁস আস্তে-আস্তে বললে। 'এত ভালো লাগে টুপ করে ডুব দিয়ে একেবারে তলায় চলে যেতে!'

'হ্যাঁ, মজাই তো! পাগল না-হলে কেউ এমন কথা বলে! বেড়ালকে একবার বলে দেখো না—ওর মতো চালাক তো মানুষ ছাড়া কেউ নয়—জলে সাঁৎরাতে কি ডুব দিতে কেমন লাগে, ওকে জিগেসই করো না—আমার কথা কিছু না-ই বললাম। বলে দেখো একবার বুড়ি-মাকে—তাঁর মতো চালাক তো পৃথিবীতে কেউ নয়— তাঁর কি ইচ্ছে করে জলে নামতে? তাঁর কি ভালো লাগে জলে ডুব দিতে?'

'আমার কথা তোমরা বুঝছ না', হাঁস বললে।

'আমরা তোমার কথা বুঝি নে, না? তাহলে বোঝে কে শুনি? তুমি কি বলতে চাও বেড়ালের চাইতে, কি বুড়ি-মার চাইতে তুমি বেশি বুদ্ধি রাখ—নিজের কথা কিছু বলব না। দেমাকে তোমার মাটিতে পা পড়ে না দেখছি! অনেক করেছি আমরা

তোমার জন্যে— এখন নেমকহারামি করো না। এখানে থাকতে কি তোমার কোনো কষ্ট হয়েছে, নাকি তুমি মুখ্যু লোকের পাল্লায় পড়েছ! কত শিখতে পারতে তুমি এখানে থাকলে—কিন্তু তুমি দেখছি ফাজিলকান্ত, বাজে বকুনিই তোমার সার। তোমার সঙ্গে মেলামেশা করে সুখ নেই। রাগ করো না, তোমার ভালোর জন্যেই বলছি। সত্যিকারের বন্ধুরাই কটু কথা বলে। এখনো ডিম পাড়তে শিখতে পারো কিনা দেখো—কি গোঁ-গোঁ আওয়াজ করতে আর চোখ দিয়ে ফুলকি বার করতে।'

'আমার ইচ্ছে করে এই মস্ত পৃথিবীতে বেরিয়ে পড়ি।'

'যাও না, কে তোমাকে ধরে রেখেছে।' মুরগি চটে গিয়ে বললে। গেল সে চলে।

জলে সাঁৎরায়, জলে সে ডুব দেয় ; কিন্তু যেখানেই যায়, সবাই তাকে দূর-দূর করে। যেহেতু দেখতে সে কুৎসিত।

শীত এলো বলে। গাছের পাতা শুকিয়ে হলদে হয়ে আসছে ; 'পাতাগুলোকে ঝুঁটি ধরে নাচিয়ে বেড়াচ্ছে উত্তুরে হাওয়া। উপরের হাওয়া কনকনে ঠাণ্ডা, মেঘগুলো নিচে ঝুলছে, শিলায় আর বরফে ভারি। ঠাণ্ডার চোটে দাঁড়কাক কা-কা করছে বেড়ায় দাঁড়িয়ে—ইশ, ভাবতেই শীত করে। বেচারা হাঁসের খুব ফুর্তি লাগছিল না ঠিকই। এক সন্ধ্যায়—ঠিক তখন সূর্য ডুবছে সুন্দর হয়ে—হঠাৎ ঝোপের আড়াল থেকে এক ঝাঁক পাখি উড়ে উঠে এলো, চোখ-ঝলসানো শাদা তাদের রং, লম্বা ঘাড় যেমন খুশি বাঁকানো যায়—রাজহাঁস! অতি অদ্ভুত এক রকম শব্দ করতে-করতে তারা ছড়িয়ে দিলে তাদের বিশাল উজ্জ্বল পাখা, উড়ে চলল সেই ঠাণ্ডা দেশ থেকে উষ্ণ হাওয়ায়, উজ্জ্বল উন্মুক্ত হ্রদে। কত উঁচুতে তারা উঠলো, আরো কত উঁচুতে! আর তাদের দেখতে-দেখতে কেমন করে উঠল আমাদের এই কুৎসিত বাচ্চা হাঁসের বুকের ভিতরটা। চাকার মতো ঘুরে-ঘুরে সে জলের উপরে উঠল, গলা বাড়িয়ে দিলে সেই আশ্চর্য পাখিদের দিকে, এমন অদ্ভুত আওয়াজ করতে লাগল যে নিজেই চমকে উঠল। ভুলতে সে পারলে না তাদের—সেই সুন্দর পরম সুখী পাখিরা ; আর যে-মুহূর্তে তারা তার চোখের আড়াল হয়ে গেল সে ডুব দিলে জলের একেবারে তলায়, আর উঠে যখন এল, সে যেন আর সে নেই। ঐ পাখিদের নাম জানে না সে, জানে না কোথায় যাচ্ছে তারা ; কিন্তু তাদের মতো আর কাউকেই সে কখনো ভালোবাসে নি। ওদের দেখে মোটেও হিংসে হল না ওর মনে--ওদের মতো রূপ তার হবে, এ কি স্বপ্নেও ভাবা যায়! সে ধন্য হয়ে যেত, যদি শুধু ওরা তাকে দলে নিত, দয়া করে ওকে সহ্য করত—কুৎসিত, উদ্ভট এই জীব!

শীত বাড়তে লাগল—মাগো, কী ঠাণ্ডা! সারাক্ষণ জলের উপর সাঁতার না-কেটে উপায় নেই—তা না-করলেই জল জমে যাবে। তবু—যে-গর্তের মধ্যে সে সাঁতার কাটছে, রোজ তা একটু-একটু করে ছোটো হয়ে আসছে। এমন শক্ত হয়ে বরফ জমেছে যে বাইরের খোশাটা ফেটে যাচ্ছে মাঝে-মাঝে ; তার ছোট গর্তটুকু যাতে

জমে না যায় সে-জন্যে তাকে পা চালাতে হচ্ছে প্রাণপণে। শেষটায় সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল, শুয়ে পড়ল চুপ করে, বরফের মধ্যে হিম হয়ে জমে গেল।

ভোরবেলা সেখান দিয়ে যেতে-যেতে এক চাষা দেখতে পেল ব্যাপারটা। তার কাঠের জুতো খুলে সে ভাঙল বরফের চাকা, তারপর হাঁসের বাচ্চাকে বাড়িতে নিয়ে এল তার স্ত্রীর কাছে। সেখানে এসে হাঁসের জ্ঞান হল। বাড়ির ছেলেপুলেরা তার সঙ্গে খেলা করতে চাইল, কিন্তু সে ভাবল তারা বুঝি মারবে তাকে, ভয়ের চোটে উড়ে গিয়ে পড়ল একেবারে দুধের কড়াইতে, উলটিয়ে উপচিয়ে পড়লো দুধ ঘর ভরে। গিন্নিঠাকরুন দুহাত একত্র করে চেঁচিয়ে উঠলেন, বেচারা তাতে আরো বেশি ভয় পেয়ে পড়বি তো পড় একবার মাখনের বাটিতে, একবার খাবারের থালায়। কী চেহারাই হল তার তখন! গিন্নিঠাকরুন উনুন খোঁচাবার সাঁড়াশি হাতে নিয়ে তাকে মারতে ছুটলেন, ছেলেপুলেরা তাকে ধরবার চেষ্টায় এ ওর ঘাড়ে হুটোপুটি খেতে লাগলা—কী তাদের হাসি আর চ্যাঁচামেচি! ভাগ্যিশ দরজাটা ছিল খোলা, তাই এই পোড়াকপালে হাঁস প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাঁচল। বাইরে নতুন-পাতা বছরের বিছানায় ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়লো সে।

সারাটা শীত ভরে যত কষ্ট সে পেল সব বলতে গেলে এমন মন-খারাপ হয়ে যাবে যে শেষ পর্যন্ত বলতে পারব না। কাটল শীত, কাটল বর্ষা, আবার শরৎ এল। আবার আকাশ হেসে উঠল রোদে, আর পাখিরা গান করে উঠল ; আর সে গা মেলে দিলে বিলের বাঁশ-ঝোপের মধ্যে। কী সুন্দর হয়েই শরৎ এসেছে এবার!

আর হঠাৎ এই কুৎসিত হাঁস পাখা ঝাপটে উঠল। নতুন জোর যেন এসেছে তার পাখায়, বাতাসের ভিতর দিয়ে তাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল। এ কী! এখানে কখন এল সে? এ যে বাগান! কী সুন্দর লম্বা গাছগুলো, কী মিষ্টি সবুজ পাতার গন্ধ! মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে যে-খালটা গেছে, তার টলটলে জলে লম্বা সবুজ ডালগুলো নুয়ে পড়েছে। কী সুন্দর সব এখানে, শরৎকালের প্রাণ-খোলা ফুর্তি! এই তো ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল ঝকঝকে শাদা তিনটি রাজহাঁস—কী সুন্দর, কী আশ্চর্য সুন্দর! পাখার খশখশানিতে আকাশ গেল ভরে, জলের বুকে অপরূপ হয়ে পড়ল তাদের ছায়া। সে চেনে, এই আশ্চর্য সুন্দর পাখিদের চেনে সে! তাদের দেখতে-দেখতে বুক তার ভারি হয়ে উঠল—সে ভারি অদ্ভুত!

'আমি উড়ে যাব তাদের কাছে, রাজার মতো এই পাখিদের কাছে যাব আমি! তারা আমাকে মারবে, আমাকে মেরে ফেলবে—এত কুৎসিত হয়েও তাদের কাছে যেতে যে আমি সাহস করছি। কিছু এসে যায় না তাতে! আমাকে পাতিহাঁসের দল তাড়া করেছে, মুরগিরা ঠুকরে খেয়েছে, সেই মেয়েটার লাথিও তো আমি খেয়েছি, আর এই সমস্তটা শীত প্রায় উপোস করেই কাটল। ঢের ভালো তার চাইতে তাদের হাতে মরা! উড়ে গিয়ে বসল সে জলের বুকে, এগিয়ে গেল রাজার মতো পাখিদের কাছে : আর তারা তার দিকে তাকাল, পাখা মেলে দিয়ে তার কাছে আসতে

লাগল। 'মারো, মারো আমাকে!' সে বলে উঠল, তারপর জলের উপর মাথা নিচু করে রইল মৃত্যুর প্রতীক্ষায়। কিন্তু সেই টলটলে জলের বুকে কী দেখল সে? কী? দেখল তার নিজের ছায়া—এ কী! সে তো আর নয় সেই বিশ্রী বেঢপ পাখির ছানা, ছাইয়ের মতো রং, এত কুৎসিত যে দেখতে ঘেন্না করে; সে যে—রাজহাঁস!

রাজহাঁসের ডিমের মধ্যে যে ছিল, পাতিহাঁসের উঠোনে জন্মালে তার কি কিছু এসে যায়?

এখন সে বুঝতে পারলে তার চারদিকে যে-নতুন সুখের জ্যোতি—আর যত কষ্ট সে সয়েছে, যত দুঃখ পেয়েছে, সব মনে করে সে খুশি হয়ে উঠল। আর সেই বড়ো পাখিরা তাকে ঘিরে ঘুরতে লাগল, ঠোঁট দিয়ে তাকে আদর করলে।

এল ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়েরা সেই বাগানে, জলে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে দিলে রুটির টুকরো আর মুঠি-মুঠি চাল, আর তাদের মধ্যে সবচেয়ে যে ছোটো সে বলে উঠল, 'এই তো নতুন একজন!' আর অন্যরা ফুর্তিতে চেঁচিয়ে উঠল, 'হ্যাঁ, নতুন একজন এসেছে!' হাত-তালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল তারা, নেচে বেড়াল, ছুটে গেল মা-বাপের কাছে; কত রুটি আর কত পিঠে পড়ল জলে, আর তারা সবাই বললে, 'সবচেয়ে, সবচেয়ে ও সুন্দর! এমন সুন্দর—আর এত অল্প বয়েস!' আর বুড়ো রাজহাঁসেরা মাথা নিচু করল তার কাছে এসে।

তখন তার কেমন লজ্জা করতে লাগল, পাখার মধ্যে মুখ লুকোল সে—কী করবে ভেবে পেল না। এত সুখ তার মনে, কিন্তু একটুও গর্ব নয়। কত নির্যাতন, কত অপমান সে সয়েছে—আর এখন এরা বলছে যে সে-ই হচ্ছে পাখিদের মধ্যে পরম সুন্দর। গাছগুলো পর্যন্ত তাদের লম্বা ডালগুলো জলে নুইয়ে দিচ্ছে তার সামনে, আর ঝরে পড়েছে সোনালি হয়ে, নরম হয়ে। আর তার পাখা খশখশিয়ে উঠল, সে তুলল তার সরু ঘাড়, তার বুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল এই কথা:

'কে জানত রাজার মতো পাখিদের আমিই হব রাজা!'

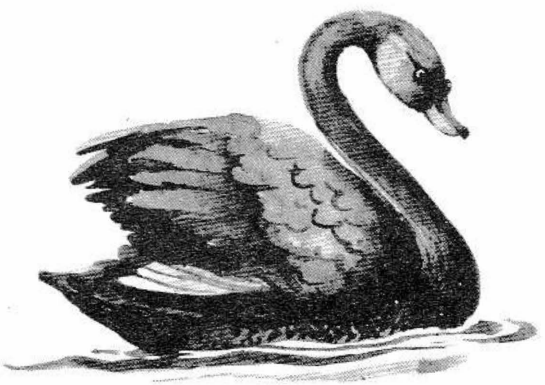

কোকিল ও কলের কোকিল

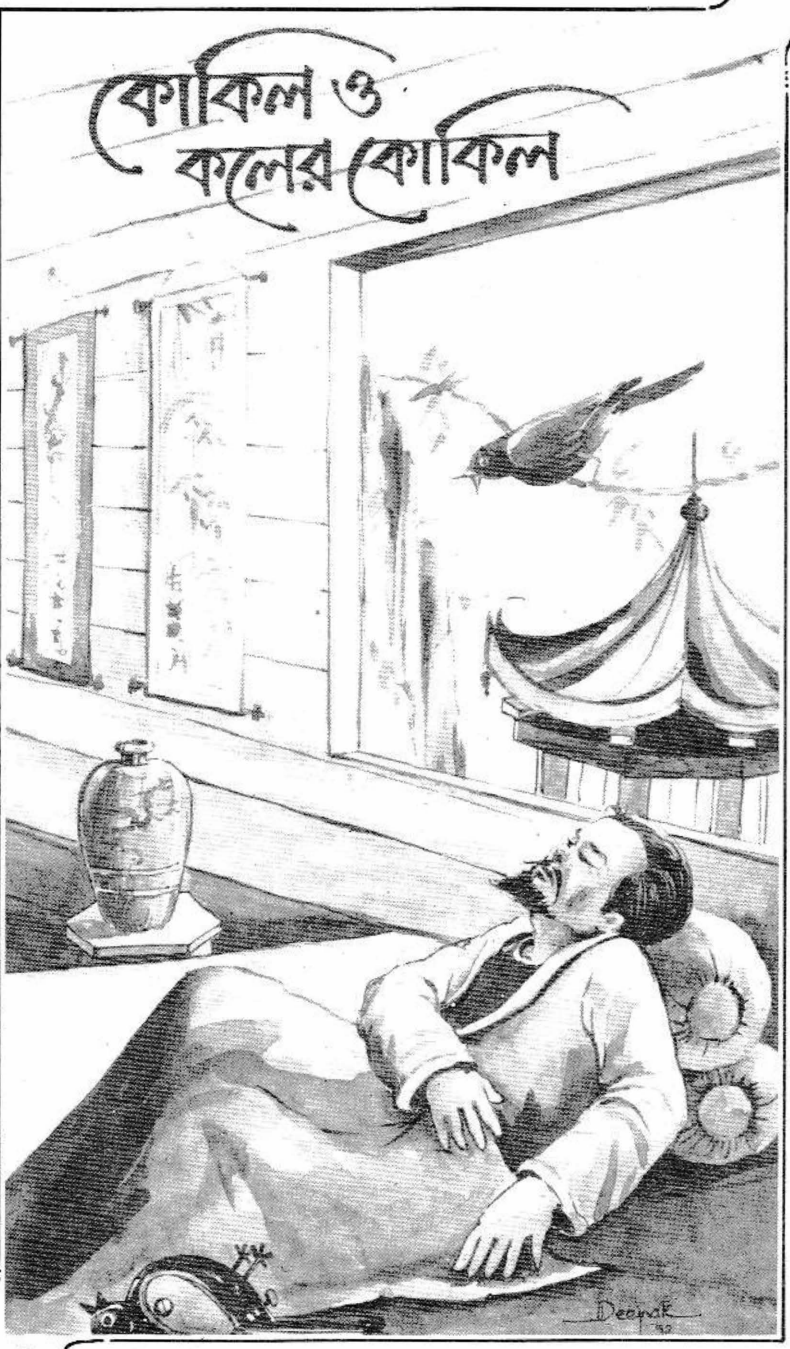

শোনো তবে।—

চীনদেশের রাজা একজন চীনেম্যান, তাঁর আগে পিছে ডাইনে-বাঁয়ে যত লোক, তারাও সব চীনে। এটা ঘটেছিল অনেক দিন আগে, কিন্তু সেইজন্যেই তো গল্পটা বলছি, পাছে সবাই ভুলে যায়। রাজার ছিল এক প্রাসাদ, অমন আর পৃথিবীতে হয় না। আগাগোড়া চীনেমাটির তৈরী, ভীষণ দামি, এমন হালকা আর ঠুনকো যে ছুঁতে ভয় করে। বাগানে ফোটে কত আশ্চর্য ফুল ; সবচেয়ে যেগুলো দামি তাদের গলায় রুপোর ঘণ্টা বাঁধা, কাছ দিয়ে যদি হেঁটে যাও, ঘণ্টার শব্দে ফিরে তাকাতেই হবে। বুঝলে, রাজার বাগানে সব ব্যবস্থাই চমৎকার। এত বড়ো বাগান, মালি নিজেই জানে না তার শেষ কোথায়। যদি কেবলই হেঁটে চল, আসবে এক বনের ধারে। কী সুন্দর বন, তাতে মস্ত উঁচু গাছ আর গভীর হ্রদ। বন সোজা সমুদ্রে চলে গেছে, নীল জলের অতল সমুদ্র, আর ঝুঁকে-পড়া ডালপালার পাশ দিয়ে কত বড়ো-বড়ো জাহাজের আনাগোনা ; আর সেই ডালপালার আড়ালে লুকিয়ে থাকে এক কোকিল। কী মধুর তার গান, এত মধুর যে জেলে মাছ ধরতে এসে হাতের কাজ ফেলে চুপ করে শোনে, যখন শেষরাত্রে জাল নিয়ে এসে সে শোনে কোকিলের স্বর।

'কী সুন্দর গান!' জেলে ভাবলে। কিন্তু সে তার মাছ-ধরার কাজে মেতে রইল, ভুলে গেল কোকিলের কথা। পরের দিন শেষ রাত্রে কোকিল যখন আবার গান করে উঠল, জেলে আবার শুনল, শুনে ভাবলে, আহা, কী গান!'

নানা দেশ থেকে নানা লোক আসে সেই রাজধানীতে, দেখে বাহবা দেয়। রাজার প্রাসাদ আর বাগান দেখে তাদের চোখের পলক আর পড়ে না। কিন্তু কোকিলের গান যেই তারা শোনে, অমনি বলে ওঠে : 'আহা, এমন আর হয় না!'

দেশে ফিরে এসে তারা কোকিলের গল্প করে ; পণ্ডিতেরা বড়ো-বড়ো পুঁথি লেখেন চীন রাজার প্রাসাদ নিয়ে, বাগান নিয়ে। কিন্তু কোকিলকে কি তাঁরা ভুলতে পারেন? সেই পাখির প্রশংসা হাজার পাতা জুড়ে, আর কবিরা হ্রদে-ঘেরা বনের বুকের সেই আশ্চর্য পাখিকে নিয়ে আশ্চর্য সব কবিতা লেখেন।

পুঁথিগুলো পৃথিবীতে কে না পড়ল! আর চীন রাজার হাতেও কয়েকখানা এসে পড়ল বইকি। তাঁর সোনার সিংহাসনে ব'সে-ব'সে তিনি পড়লেন, আরো পড়লেন, পড়তে পড়তে কেবলি খুশি হয়ে মাথা নাড়তে লাগলেন—কেবল তাঁর রাজধানীর, তাঁর প্রাসাদের, তাঁর বাগানের এত সব উচ্ছ্বসিত বর্ণনা পড়ে বড়ো ভাল লাগল তাঁর। 'কিন্তু সবচেয়ে ভালো হচ্ছে কোকিল পাখি', সেখানে স্পষ্ট করে লেখা।

ব্যাপার কী?

রাজা চমকে উঠলেন। 'কোকিল! সে কী জিনিস? ও-রকম কোনো পাখি আছে নাকি আমার রাজত্বে? আমার বাগানেও নাকি আছে! আমি তো কখনো শুনি নি! কী কাণ্ড, তার কথা আমি প্রথম জানলাম এ-সব বই পড়ে।'

রাজা তাঁর প্রধান অমাত্যকে ডেকে পাঠালেন। তিনি এতই প্রধান যে তাঁর নিম্নস্থ কেউ যদি কখনো সাহস করে তাঁর সঙ্গে কথা বলত তিনি শুধু জবাব দিতেন : 'পিঁ!' আর তার অবিশ্যি কোনো মানে হয় না।

'কোকিল বলে এক আশ্চর্য পাখি নাকি এখানে আছে', রাজা বললেন। 'এঁরা বলছেন আমার এত বড়ো রাজত্বে সেটাই শ্রেষ্ঠ জিনিস। কই, আমি তো তার কথা কখনো শুনি নি!'

প্রধান অমাত্য একটু ভেবে বললেন, 'রাজসভায় সে তো কখনো উপস্থিত হয় নি, তার তো নামই শুনি নি, মহারাজ।'

রাজা বললেন, 'আজ সন্ধ্যায় সে আমার সভায় এসে গান করবে, এই আমার আদেশ। পৃথিবীসুদ্ধ লোক তার কথা বলতে পাগল, আর আমিই জানি নে!'

'আমার কাছে তো তার কথা কেউ বলে নি', অমাত্য বললেন। 'খুঁজব তাকে। ধরে আনব।'

কিন্তু কোথায় সে? প্রধান অমাত্য রাজপ্রাসাদের দু'শো সিঁড়ি দিয়ে দু'শোবার ওঠা-নামা করলেন, খুঁজলেন ঘরে-ঘরে, খুঁজলেন বারান্দায়—কিন্তু যাদের সঙ্গে তাঁর দেখা হল, কেউ শোনে নি কোকিলের কথা। ফিরে গেলেন তিনি রাজার কাছে, বললেন :

'মহারাজ, এ নিশ্চয়ই বই-লিখিয়েদের বানানো গল্প। যত বই লেখা হয়, তার মধ্যে কত যে থাকে বানানো মিথ্যা, মহারাজ ভাবতেও পারবেন না।'

'কিন্তু এ কী করে মিথ্যে হবে? যে-বইয়ে এ-কথা পড়েছি স্বয়ং মহামহিমান্বিত জাপান-সম্রাট আমাকে তা পাঠিয়েছেন। কোকিলের গান আমি শুনবই। আজ সন্ধ্যায় রাজসভায় তার উপস্থিতি চাই-ই। যদি সে না আসে তাহলে আজ সান্ধ্য-ভোজের পর আমার সমস্ত সভাসদ হাতির নিচে পড়ে মরবে।'

'চুং-পিঁ!' প্রধান অমাত্য বলে উঠলেন। তারপর আবার তিনি ওঠা-নামা করলেন দু'শো সিঁড়ি দিয়ে, খুঁজলেন সবগুলো ঘর, সবগুলো বারান্দা, আর সভাসদরা ছুটল তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে, যেহেতু হাতির নিচে পড়ে মরতে কারুরই পছন্দ নয়।

শেষটায় রান্নাঘরে ছোটো একটি মেয়ের সঙ্গে তাদের দেখা, রাজার পাঁচশো রাঁধুনির জন্যে পাঁচশো ঝি, সেই ঝিদের মধ্যে সবচেয়ে ছোটো সে। সে বললে :

'কোকিল? আমি তো রোজই শুনি তার গান—আহা, সত্যি বড়ো ভালো গায়। আমার মা অসুখে পড়ে আছেন সমুদ্রের ধারে এক কুঁড়ে ঘরে, রোজ সন্ধ্যায় ভোজের পাত-কুড়োনো নিয়ে যাই তাঁর কাছে। যাবার পথে ক্লান্ত লাগে, বনের মধ্যে একটু জিরিয়ে নিই। তখন শুনি কোকিলের গান, শুনতে শুনতে চোখ আমার জলে ভরে যায়—মনে হয় মা আমাকে চুমো খেলেন।'

প্রধান অমাত্য গম্ভীরমুখে বললেন, 'আজ সন্ধ্যায় কোকিলের রাজসভায় আসবার কথা। তুমি পারবে আমাদের তার কাছে নিয়ে যেতে? যদি পারো, এক্ষুনি

তোমাকে রাঁধুনি করে দেবো, তা ছাড়া মহারাজ যখন ভোজে বসবেন তুমি দরজার ধারে দাঁড়িয়ে দেখবার অনুমতি পাবে।'

তখন তারা সবাই মিলে গেল সেই বনে, কোকিল যেখানে গান গায়, গেল মন্ত্রী, সেনাপতি, উজির, নাজির, হাকিম, পেশকার। পথ দিয়ে তারা চলেছে, এমন সময় একটা গোরু হাম্বা-হাম্বা করে উঠল।

সেনাপতি বলে উঠলেন, 'বাঃ, ওই তো! এ আমি আগেও শুনেছি নিশ্চয়ই। অতটুকু শরীরে এত জোর! সাবাস!'

ছোটো মেয়েটি বললে, 'এ তো গোরু ডাকছে। সে-জায়গাটা আসতে এখনো দেরি আছে।'

তারপর শোনা গেল পুকুরের ধারে ব্যাঙের ডাক।

মন্ত্রী বলে উঠলেন, 'ওহো! এই তো স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে—ঠিক যেন মন্দিরের ঘণ্টা!'

'এ তো ব্যাঙ ডাকছে', মেয়েটি বললে। 'এক্ষুনি কোকিলের গান শোনা যাবে।'

তারপর কোকিল গান করে উঠল।

'ওই তো!' মেয়েটি বললে। 'শুনুন আপনারা, শুনুন—ওই তো সে বসে আছে।' মেয়েটি একটা গাছের ঘন ডালের দিকে আঙুল তুলে দেখাল।

অনেকক্ষণ উঁকিঝুঁকি লাফঝাঁপ মেরে অনেক চেষ্টায় সবাই সেই কাল পাখিকে দেখতে পেল। প্রধান অমাত্য বলে উঠলেন, 'আরে এ আবার একটা পাখি নাকি! মরি মরি, কী রূপ!'

সমস্ত দল এই রসিকতায় হেসে উঠল।

সেনাপতি বললেন, 'বোধহয় আমাদের সবাইকে দেখে ঘাবড়ে গিয়ে ওর অমন চেহারা হয়েছে।'

এ-কথাটা নিয়েও খুব হাসাহাসি হল।

মেয়েটি গলা চড়িয়ে বললে, 'কোকিল, শুনছ? আমাদের সর্বগুণসম্পন্ন সম্রাট তোমার গান শোনবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!' কোকিল তক্ষুনি মহা উৎসাহে গান গাইতে আরম্ভ করল।

'ঠিক জলতরঙ্গ বাজনার মতো!' প্রধান অমাত বললেন, 'এতদিন যে আমরা শুনি নি এই তো আশ্চর্য! সভায় খুব নাম হবে পাখির!'

কোকিল ভেবেছিল সম্রাট বুঝি সেখানে উপস্থিত, তাই সে জিগেস করলে, 'মহারাজ কি আবার আমার গান শুনবেন?'

প্রধান অমাত্য গম্ভীরস্বরে বললেন, 'বেশ গান তোমার, কোকিল। আজ রাজপ্রাসাদের সান্ধ্যউৎসবে তোমাকে আমি নিমন্ত্রণ করছি, সেখানে তুমি গান শুনিয়ে আমাদের অর্ধভূলোকেশ্বর সম্রাটকে মুগ্ধ করবে।'

কোকিল আদ্ধেক কথা বুঝতেই পারলে না। 'আমার গান তো এই সবুজ বনেই সবচেয়ে ভালো শোনায়', সে বললে।

তবু সম্রাটের নিমন্ত্রণে সে এল।

রাজসভায় আজ উৎসব-সজ্জা। শাদা চীনেমাটির দেয়াল আর মেঝে হাজার সোনার আলোয় ঝলোমলো। সবচেয়ে আশ্চর্য ফুলগুলো রাখা হয়েছে ওঠবার সিঁড়িতে, ঢোকবার দরজায়, ঘণ্টা বাজিয়ে তারা নিজেদের জাহির করছে। সব সময় হাওয়া থাকে না, আর হাওয়া না-হলে ঘণ্টা বাজে না ; সেইজন্যে একটা যন্ত্রের ভিতরে হওয়া তৈরী করে নলের মুখ দিয়ে সারাক্ষণ বওয়ানো হচ্ছে—ঘণ্টাগুলো এতে জোরে বাজছে যে কথা বলে নিজে শোনা দায়।

সভার ঠিক মাঝখানে সোনার একটা ডালে হীরের পাতা বসানো, কোকিল সেখানে বসবে।

সভাসদরা বসেছেন সাজের আর অলংকারের ঝিলিক তুলে, আর সেই ছোটো মেয়েটি দরজার আড়ালে —সে এখন রাজ-রাঁধুনির পদ পেয়েছে। সবাই কোকিলের দিকে তাকিয়ে ; স্বয়ং সম্রাট চোখের ইশারায় তাকে উৎসাহ দিচ্ছেন।

আর কোকিল এমন আশ্চর্য গান করলে যে সম্রাটের দু'চোখ জলে ভরে উঠল, চোখ ছাপিয়ে বেয়ে পড়ল গাল দিয়ে ; তখন কোকিল গাইল আরো মধুর, আরো তীব্রমধুর স্বরে, তা সোজা বুকের মধ্যে এসে লাগল। সম্রাট এত খুশি হলেন যে তিনি তাকে তাঁর এক পাটি সোনার চটি গলায় পরবার জন্যে দিতে চাইলেন। কিন্তু কোকিল বললে :

'মহারাজ, আমাকে ক্ষমা করুন, আমি আর-কিছু নিতে পারব না, যথেষ্ট পুরস্কার আমি পেয়েছি। আমি সম্রাটের চোখে অশ্রু দেখেছি—সে-ই তো আমার পরম ঐশ্বর্য! সম্রাটের অশ্রুর অদ্ভুত ক্ষমতা—এত বড়ো পুরস্কার আর কী আছে!'

সভার মেয়েরা বললেন, 'বাঃ, গলার কী কায়দা দেখেছ!' আর এর পর থেকে কেউ তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে এলে তাঁরা গলায় জল নিয়ে কুলকুচি করতে লাগলেন—ভাবলেন অমনি করে তাঁরাও বুঝি কোকিল হতে পারবেন। আর প্রাসাদের ঝি-চাকররাও জানালে যে তারা খুব খুশি হয়েছে। সেটা মস্ত কথা, কেননা ঝি-চাকরদের খুশি করাই সবচেয়ে শক্ত। এক কথায় বলতে গেলে, রাজসভায় এসে কোকিল দস্তুরমতো উৎরে গেল।

তখন থেকে রাজসভাতেই তার বাসা হল, নিজের সোনার খাঁচায়। দিনের মধ্যে দু'বার সে বেরোতে পারে, আর রাত্রে একবার। আর তার বেরোবার সময় সঙ্গে থাকে বারোজন চাকর, তাদের প্রত্যেকের হাতে পাখির পায়ের সঙ্গে বাঁধা রেশমি সুতো শক্ত করে ধরা। এ-রকম বেড়ানোয় কোনো সুখ নেই, সত্যি বলতে।

শহরের সবাইর মুখে এই আশ্চর্য পাখির গল্প। দু'জন লোকে যখনই দেখা হয়, একজন যদি বলে 'কো', অমনি আর-একজন বলে উঠবে, 'কিল!' তারপর

দু'জনেই দীর্ঘশ্বাস ফেলবে, একে অন্যের মনের ভাব বুঝতে পারবে। ফিরিওয়ালাদের এগারোটি ছেলেপুলের নাম রাখা হল কোকিল, কিন্তু তাদের একজনও গানে একটা টান দিতেও পারে না।

একদিন রাজার নামে এল মস্ত একটা পার্সেল, তার গায়ে বড়ো-বড়ো অক্ষরে লেখা, 'কোকিল।'

'এই বিখ্যাত পাখি সম্বন্ধে নতুন একটা বই এল', রাজা বললেন।

কিন্তু বই তো নয়, বাক্সের মধ্যে ছোটো একটা জিনিস। চমৎকার কাজ করা একটা কলের কোকিল, মণি মুক্তো হীরে জহরতে ঝলোমলো, সত্যিকারের পাখির মতো তার গান। কলের পাখিটায় দম দিয়েছ কি সে অবিকল কোকিলের মতো গাইতে শুরু করবে, আর সঙ্গে-সঙ্গে দুলবে তার সোনা-রূপোর কাজ-করা ল্যাজ। গলায় তার ছোট্ট ফিতে বাঁধা, তাতে লেখা : 'জাপানের মহামহিমান্বিত সম্রাটের কোকিলের তুলনায় চীনসম্রাটের কোকিল কিছুই নয়।'

'বাঃ, চমৎকার তো,' সবাই একসঙ্গে বলে উঠল ; আর যে লোকটি কলের কোকিল নিয়ে এসেছিল, সে তক্ষুনি প্রধান-কোকিলবাহক উপাধি পেল।

'এখন এরা দু'জন একসঙ্গে গান করুক', রাজা বললেন। 'সে কী চমৎকারই হবে!'

দু'জনে একসঙ্গে গাইল, কিন্তু বেশি জমল না। কারণ কলের কোকিল গাইল বাঁধা গৎ, আর সত্যিকারের কোকিল গাইল নিজের খেয়ালে।

প্রধান-কোকিলবাহক বললে, 'আমাদের কোকিলের কিছু দোষ নয় ; ও বাঁধা সুরে গায়—একেবারে নিখুঁত।'

তারপর কলের কোকিল একা গাইল। আসল কোকিলেরই মতো সে মুগ্ধ করলে—তার উপর সে দেখতে অনেক ভালো, বাজুবন্ধহারের মতো ঝলমল করছে।

একবার নয়, দু'বার নয়, বত্রিশবার কলের কোকিল সেই একই গৎ গাইল, তবু ক্লান্ত হল না। অমাত্যদের আবার শুনতেও আপত্তি নেই, কিন্তু সম্রাট বললেন, 'এখন জ্যান্ত কোকিল কিছু গান করুক।'

কিন্তু কোথায় সে?

কখন সে উড়ে গেছে খোলা জানলা দিয়ে, ফিরে গেছে বনের সবুজ বুকে, কেউ লক্ষ করে নি।

'কোথায় গেল ও?' রাজা জিগেস করলেন।

তখন সভাসদরা সবাই কোকিলকে বিস্তর গালমন্দ করলে, কেউ বললে নেমকহারাম, কেউ বললে জংলি।

'থাকগে, যে-পাখি আমাদের আছে তা-ই ভালো', সবাই বললে।

আর তারপর অবিশ্যি কলের কোকিলকে আবার গাইতে হল, চৌত্রিশবারের বার একই গৎ তারা শুনলে। গৎটা বড়ো শক্ত, এত শুনেও তাদের মুখস্থ হল না। রাজসভার সংগীতবিশারদ পাখিটাকে বিশেষ প্রশংসা করলেন ; শুধু যে ওর পালকগুলো অনেক সুন্দর, মণিমুক্তোয় ঝকঝকে তা নয়, ওর ভিতরটাও ঢের ভালো।

'পূজনীয় সম্রাট, উপস্থিত ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ, এটা তো আপনারা দেখছেন যে আসল কোকিলের বেলায় আগে থেকে কিছুই বোঝা যায় না, কোনো নিয়ম মেনেই চলে না সে। কিন্তু কলের কোকিল আগাগোড়া নিখুঁত হিসেব-করা, তাকে বোঝা যায়, খুলে দেখা যায়, কোত্থেকে আসছে সুর, কেমন করে আসছে, কোনটার পর কোনটা—সব একেবারে স্পষ্ট।'

'ঠিক আমাদের মনের কথাটি বলেছেন', সবাই বললে।

পরের পূর্ণিমায় রাজ্যের সব প্রজাদের নিমন্ত্রণ হল এই পাখি দেখতে—সংগীত বিশারদ দেখাবেন। গানও শুনতে হবে তাদের, রাজার হুকুম। গান তারা শুনল—একবার নয়, দু'বার নয়, ছত্রিশবার। এত খুশি হল তারা গান শুনে, যেন ছত্রিশ পেয়ালা চা খেয়েছে—চীনদেশে, জানো তো, চা খাওয়াটাই রেওয়াজ। কেউ বললে আহা, কেউ বললে ওহো ; কেউ ঘাড় নাড়লে, কেউ নাড়লে মাথা। কিন্তু সেই যে জেলে, বনের মধ্যে আসল কোকিলের গান যে শুনেছিল, সে বললে, 'মন্দ নয়, কিন্তু যতবার গাইল একরকমই লাগল যেন। আর কী-যেন একটা নেই মনে হল।'

কথাটা সংগীতবিশারদ শুনে ফেললেন। ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কী নেই বল তো বাপু? তালে লয়ে সুরে মানে একেবারে নিখুঁত!'

জেলে বেচারা ঘাবড়ে চুপ করে গেল। কী নেই, নিজের কাছেও সে বলতে পারবে না।

আসল কোকিল নির্বাসিত হল দেশ থেকে। নকল পাখিটা রইল রাজার হালে ; সম্রাটের বিছানার পাশে রেশমি বালিশে সে ঘুমোয়, চারদিকে মণিমুক্তো হীরে-জহরতের সব উপঢৌকন ছড়ানো ; উপাধি হল তার রাজ-ভোজান্ত-গীতরাজ ; পদ পেল সে বাম-প্রথমের—অর্থাৎ রাজার বাঁ দিকে সবার আগে যে বসে। রাজার ধারণা, শরীরের যেদিকে আমাদের হৃৎপিণ্ড সেদিকটাই প্রধান, আর রাজার শরীরেও হৃৎপিণ্ড বাঁ দিকেই বসানো। সংগীতবিশারদ এই নকল পাখি সম্বন্ধে পঁচিশখানা মোটা-মোটা পুঁথি লিখে ফেললেন— তাঁর লেখা যেমন লম্বা তেমনি গুরু-গম্ভীর, চীনে ভাষার যত শক্ত-শক্ত কথা সব আছে তাতে—তবু সবাই বললে যে তারা সবটা পড়েছে এবং পড়ে বুঝেছে, পাছে কেউ বোকা ভাবে, কি সংগীতবিশারদ চটে গিয়ে পাগলা হাতির নিচে তাদের থেঁৎলে মারেন।

কাটল এক বছর এমনি করে। কলের পাখির গানের প্রত্যেকটি ছোটো-ছোটো টান সম্রাটের মুখস্থ, তাঁর পারিষদদের মুখস্থ, প্রত্যেক চীনের মুখস্থ। সেইজন্যেই

তাদের তা এত ভাল লাগে—সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও গাইতে পারে, গায়ও। রাস্তার ছোকরারা গান করে 'কু-কুক্কু।। কু-ক্কু! কু-কু!' স্বয়ং সম্রাটও তা-ই গান করেন। পাখিটার কিছু নাম হল বটে।

এরই মধ্যে একদিন হল কী—কলের পাখি গেয়ে চলছে, এত ভাল সে আর কখনোই যেন গায় নি—সম্রাট শুনছেন বিছানায় শুয়ে। হঠাৎ পাখিটার ভিতরে একটা শব্দ হল, 'গ্‌রর্‌র্‌র্‌! কী যেন একটা ছিঁড়ে গেল 'গঁ-গঁ-গ্‌রর্‌র্‌র্‌!' সবগুলো চাকা একবার ঘুরে এল, তারপর গান গেল থেমে।

সম্রাট লাফিয়ে উঠলেন, ডেকে পাঠালেন তাঁর দেহ-পুরোহিতকে (চীন সম্রাটের চিকিৎসকের তা-ই উপাধি)—কিন্তু তিনি কী করবেন? তারপর ডাকা হল ঘড়িওলাকে—অনেক বলাবলি, অনেক খোঁজাখুঁজি, টুকটাক ঠুকঠাকের পর পাখিটাকে কোনোরকমে মেরামত করা গেল বটে, কিন্তু আগের জিনিস আর হল না। ঘড়িওলা বলে গেল একে যেন খুব সাবধানে নাড়াচাড়া করা হয়, কলকব্জা গেছে খারাপ হয়ে, নতুন আর বসানো যাবে না। এর পর থেকে বছরে একবারের বেশি একে গাওয়ানো যাবে না, আর তাও না-গাওয়ালেই ভালো। রাজ্যে হাহাকার পড়ে গেল। কিন্তু সংগীতবিশারদ সমস্ত প্রজাদের সামনে ছোটো একটা বক্তৃতা করলেন, ভারি-ভারি সারবান কথায় বুঝিয়ে দিলেন যে পাখিটা আগের মতোই ভালো আছে—সুতরাং সন্দেহ নেই পাখিটা আগের মতোই ভালো আছে।

পাঁচ বছর কেটে গেল—এবার রাজ্যে সত্যিকারের হাহাকার। চীনেরা তাদের সম্রাটকে সত্যি ভালোবাসে, আর এখন শোনা যাচ্ছে সম্রাটের নাকি অসুখ, আর বেশি দিন তিনি বাঁচবেন না। এরই মধ্যে নতুন একজন সম্রাট ঠিক করা হয়ে গেছে ; আর প্রজারা রাজপ্রাসাদের বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রধান অমাত্যর কাছে খোঁজ নিচ্ছে রাজা কেমন আছেন।

প্রধান অমাত্য বলছেন, 'পিঁ!' আর মাথা নাড়ছেন।

মস্ত জমকালো বিছানায় সম্রাট শুয়ে আছেন—শরীর তাঁর ঠাণ্ডা, মুখ তাঁর ম্লান। সভাসদদের ধারণা তিনি মরে গেছেন—তাঁরা ছুটেছেন নতুন সম্রাটকে অভিনন্দন জানাতে। উজির-নাজিররা রাস্তায় বেরিয়ে এসে জটলা করছে, দাসীদের ঘরে বসেছে চায়ের আড্ডা। সমস্ত ঘরে আর বারান্দায়, আশেপাশে চারদিকে পুরু গালিচা দিয়ে মোড়া মেঝে, যাতে কোনো পায়ের শব্দ শোনা না যায়। চুপ, একেবারে চুপ। কিন্তু সম্রাট মরেন নি ; শক্ত, নিঃসাড় হয়ে শুয়ে আছেন জমকালো বিছানায়, সোনার পাড়-বসানো মখমলের পরদা দিয়ে আড়াল করা। ঘরের জানলা খোলা, আকাশ থেকে চাঁদের আলো এসে পড়েছে সম্রাটের উপর আর তাঁর কলের পাখির উপর।

অতি কষ্টে সম্রাটের নিশ্বাস পড়ছে, কেউ যেন চেপে বসেছে তাঁর বুকের উপর। চোখ মেলে তিনি তাকালেন ; দেখলেন তাঁর বুকের উপর মৃত্যু বসে, তার মাথায়

তাঁরই সোনার মুকুট, এক হাতে তাঁরই তরোয়াল, অন্য হাতে তাঁরই ঝকঝকে নিশেন। আর চারদিকে মখমলের পরদার ভাঁজের ভিতর থেকে অসংখ্য অদ্ভুত মাথা বেরিয়ে এল—বেশির ভাগ সুন্দর, কয়েকটা কুৎসিত। সম্রাটের সমস্ত জীবনে ভালো আর মন্দ কাজ তাঁর সামনে মাথা বাড়িয়ে দাঁড়িয়েছে—এখন মৃত্যু কিনা তাঁর বুকের উপর বসে!

'আমাকে মনে পড়ে?' 'দেখো তো আমাকে চিনতে পারেন কিনা?' ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা বলছে তারা। এত বেশি বলতে লাগল তারা যে সম্রাটের কপাল বেয়ে ঘাম গড়িয়ে পড়ল।

'চাই নে, এ-সব শুনতে চাই নে,' দুর্বল স্বরে সম্রাট বলে উঠলেন। 'গান! গান! বাজাও ঢাক ঢোল, বাজাও চীনে দামামা—এদের কথা আমায় আর যেন শুনতে না-হয়!'

আর তারা কেবলই কথা বলতে লাগল, আর মৃত্যু মাঝে মাঝে মাথা নাড়তে লাগল চীনেম্যানের মতো।

'গান! গান! সম্রাট বলে উঠলেন। 'ওরে আমার সোনার লক্ষ্মী পাখি, গান কর, একটা গান কর! কত সোনা তোকে দিয়েছি, দিয়েছি কত দামি-দামি উপহার, আমার সোনার চটিও বেঁধে দিয়েছি তোর গলায়—এখন গান কর, গান কর!'

কিন্তু পাখিটা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল—কে দেবে তাকে দম, আর দম না-দিয়ে দিলে সে গাইবেই-বা কী করে? আর মৃত্যু তার গর্তে-বসা চোখে একদৃষ্টিতে সম্রাটের দিকে তাকিয়ে রইল—একেবারে চুপ, এমন চুপ যে ভয় করে।

আর হঠাৎ জানলার দিক থেকে বেজে উঠল গান, আশ্চর্য মধুর গান। এ সেই ছোট্ট কোকিল, আসল কোকিল, জানলার বাইরে গাছের ডালে বসে সে গাইছে। সে শুনেছিল সম্রাট ভালো নেই, আর তাই সে এসেছে তাঁকে শান্তি দিতে, আশা দিতে। গেয়ে চলল সে একমনে, আর আস্তে-আস্তে সেই মূর্তিগুলি ম্লান হতে-হতে মিলিয়ে গেল, রক্ত উষ্ণ হয়ে উঠে জোরে বইল সম্রাটের দুর্বল শরীরে; এমন কি, মৃত্যুও কান পেতে শুনল, তারপর বললে:

'আহা—থেমো না, বাছা, থেমো না!'

'তবে আমাকে দাও ঐ ঝকঝকে সোনালি তরোয়াল, দাও ঐ চোখ-ঝলসানো নিশেন, দাও ঐ সম্রাটের মুকুট।'

আর মৃত্যু একে-একে সব ঐশ্বর্যই দিয়ে দিলে, গান শুনবে বলে। আর কোকিলের গান আর থামে না; সে গাইল কবরখানার গান, যেখানে সব চুপচাপ, যেখানে ফুটেছে শাদা গোলাপ, আর চেরির মঞ্জরীর মিষ্টি গন্ধ ভাসছে হাওয়ায়, কত শোকের অশ্রুতে যেখানকার ঘাস ভিজে গেল। সে-গান শুনতে-শুনতে মৃত্যুর বড়ো ইচ্ছে হল তার নিজের বাগানটা একবার দেখে, ভেসে চলে গেল সে জানলা দিয়ে ঠাণ্ডা শাদা খানিকটা কুয়াশার মতো।

রাজা বলে উঠলেন : 'ধন্য কোকিল, তুমি ধন্য! ওরে দেবতার দূত স্বর্গের পাখি, তোকে তো আমি চিনি! তোকেই না আমি আমার রাজত্ব থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম! তবু তুই-ই তো আজ তাড়িয়ে দিলি ঐ মূর্তির দল আমার বিছানা থেকে, তাড়িয়ে দিলি মৃত্যুকে আমার হৃদয় থেকে! কী পুরস্কার চাস তুই বল।'

কোকিল বললে, 'আমি তো পেয়েছি আমার পুরস্কার। মহারাজ, প্রথম যেদিন আমি আপনার সামনে গান করি, আপনার চোখে জল এসেছিল। তা আমি কখনো ভুলব না। যে গান গায়, ওর বেশি আর কোন মণিমুক্তো চায় সে? এখন আপনি ঘুমোন, মহারাজ, সুস্থ সবল হয়ে উঠুন, আমি আপনাকে গান শোনাই।'

গাইল কোকিল, শুনতে-শুনতে সম্রাট ঘুমিয়ে পড়লেন। সে-ঘুম মুছিয়ে দিলে তাঁর সমস্ত রোগ, সমস্ত ক্লান্তি। সকাল বেলার আলো জানলা দিয়ে তাঁর মুখের উপর এসে পড়ল ; তিনি জেগে উঠলেন—নতুন স্বাস্থ্য, নতুন উৎসাহ নিয়ে। অমাত্য কি ভৃত্য কেউ তখনো আসে নি, সবাই জানে তিনি আর বেঁচে নেই। কেবল কোকিল তখনো গান করছে তাঁর পাশে ব'সে।

'তুমি সব সময় থাকবে আমার সঙ্গে—থাকবে তো?' সম্রাট বললেন। 'তোমার যেমন খুশি গান করবে তুমি। কলের পুতুলটাকে হাজার টুকরো করে আমি ভেঙে ফেলব।'

কোকিল বললে, 'মহারাজ, মিছিমিছি ওর উপর রাগ করছেন। যতখানি ওর সাধ্য ও করেছে ; এতদিন ওকে রেখেছেন, এখনো রাখুন। আমি তো রাজপ্রসাদে বাসা বেঁধে থাকতে পারব না ; অনুমতি করুন, যখন ইচ্ছে করবে আমি আসব, এসে সন্ধে বেলায় জানলার ধারে ঐ ডালের উপর বসে গান শোনাব আপনাকে—সে গান শুনে অনেক কথা আপনার মনে পড়বে। যারা সুখী তাদের গান গাইব, যারা দুঃখী তাদের গান গাইব ; গাইব চারদিকে লুকোনো ভালো-মন্দর গান। আপনার এই ছোটো পাখিটি অনেক দূরে-দূরে ঘুরে বেড়ায়, গরিব জেলের ঘরে, চাষীদের খেতে—আপনার সভার ঐশ্বর্য থেকে অনেক দূরে যারা থাকে, যায় তাদের কাছে, জানে তাদের কথা। আপনার মুকুট পবিত্র ; কিন্তু আপনার হৃদয়ে আছে স্নেহ, তাকেই আমি ভালোবাসি। আপনাকে আমি গান শোনাব এসে, কিন্তু মহারাজ, একটি কথা আমাকে দিতে হবে।'

'যা চাও! যা-কিছু চাও তুমি!' সম্রাট নিজের হাতেই তাঁর রাজবেশ পরে উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর সোনার তরোয়াল চেপে ধরলেন বুকের উপর।

'এই মিনতি আমার, ছোটো একটা পাখি এসে আপনাকে সব কথা বলে যায় এ-কথা কাউকে বলবেন না। তাহলেই সব ভালো রকম চলবে।'

এল ভৃত্য, এল অমাত্য মৃত সম্রাটকে দেখতে। এ কী! ওই তো তিনি দাঁড়িয়ে! সম্রাট তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এসো'।

রুটি
মাড়িয়ো না

একটি মেয়ে একবার রুটি মাড়িয়ে রাস্তা পার হয়েছিল—পাছে তার জুতো নোংরা হয় ; আর তারপর তার কপালে জুটেছিল অনেক দুঃখকষ্ট। তার গল্প সবাই জানে—কেননা এ-গল্প লেখা হয়েছে, ছাপাও হয়েছে এমনকি।

নাম তার ইঞ্জে, গরিব ঘরের মেয়ে সে। কিন্তু হলে হবে কী, স্বভাবটা তার ভারি দেমাকি, মেজাজটা রুক্ষ। কথায় যেমন বলে, ভিতটাই তার খারাপ। সে যখন খুব ছোটো, তখন তার খেলা ছিল মাছিগুলোকে ধরে-ধরে তাদের পাখা ছিঁড়ে দেয়া, পোকার মতো তারা তখন বুকে হেঁটে বেড়াত, তা-ই দেখতে মজা লাগত তার। তারপর বড়ো হয়ে ফড়িং আর আরশোলা ধরে-ধরে তাদের পিন ফুটিয়ে আটকে রাখত, দিত তাদের দিকে সবুজ একটু পাতা কি ছোটো এক টুকরো কাগজ ঠেলে—বেচারারা পা দিয়ে সেটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরে উল্টিয়ে ডিগবাজি খেয়ে ছাড়া পাবার জন্যে ছটফট করতো।

'আরশোলা বই পড়ছেন', ইঞ্জে বলত। 'দেখো না বইয়ের পাতাটা কেমন উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেখছে!'

বড়ো হবার সঙ্গে-সঙ্গে তার স্বভাবটা ভালো তো হলই না, বরং আরো খারাপ হল। কিন্তু দেখতে সে ভালোই ছিল আর সেটাই হয়েছিল তার কাল। কেননা তা না-হলে লোকে হয়তো তাকে আরো কড়া শাসন করত—তাতে সে শুধরেও যেতে পারত, বলা যায় না।

'যেমন বদ তোর মেজাজ তেমনি শক্ত কোনো চাপ পড়লে তবে ঠিক হবে', তার মা-ই তাকে একশোবার এ-কথা বলতেন। 'ছোটো থাকতে তুই জামা-কাপড়গুলো টেনে-টেনে ছিঁড়তিস, একদিন ছিঁড়বি আমার বুকের শিরা—তবে ঠাণ্ডা হবি!'

তারপর সত্যি-সত্যি একদিন তাই হল।

ইঞ্জে গেল চাকরি করতে পাশের গ্রামের জমিদারের বাড়িতে। জমিদারগিন্নি বড়ো ভালোমানুষ, তাঁর নিজের মেয়ের মতোই ইঞ্জের খাওয়া-শোয়া-সাজ-পোশাক। তাতে তাকে আরো সুন্দরই দেখল, আর সেইজন্যে তার দেমাকও এত বেড়ে গেল যে মাটিতে পা পড়ে কি পড়ে না!

বছরখানেক কাজ করবার পর গিন্নিঠাকরুন তাকে ডেকে বললেন, 'ইঞ্জে, এইবার তোমাকে একবার বাপ-মাকে দেখতে যাওয়া উচিত।'

ইঞ্জে বাড়ির দিকে রওনা হল : তার গাঁয়ের সবাই তাকে চোখ খুলে দেখুক, দেখুক সে কেমন জমকালো বড়োমানুষ হয়েছে—এ ছাড়া আর-কিছুই সে ভাবলে না। গাঁয়ে ঢোকবার মুখে সে দেখলে, গরিব-গরবা মেয়ে-পুরুষের জটলা বসেছে, তার মা-ও আছেন তাদের মধ্যে, একটা পাথরের উপর বসে জিরুচ্ছেন, সামনে

পড়ে আছে একঝুড়ি খড়ি। ইঞ্জে দেখেই বুঝতে পারলে খড়িগুলো তার মা নিজের হাতেই কুড়িয়েছেন। লজ্জায় সে প্রায় মরে গেল। সে—এমন চকচকে ঝকঝকে যার পোশাক, তার মা কিনা ঐ ছেঁড়া কাপড় পরেছে, তার মা কিনা নিজের হাতে কাঠ কুড়োয়। তক্ষুনি সে গেল ফিরে, গ্রামে আর ঢুকল না। মা-র দুঃখ চোখে দেখে সইতে পারে না বলে যে ফিরে গেল তা নয়, গেল রাগ করে চলে।

তারপর আরো ছ' মাস গেল। গিন্নিঠাকরুন বললেন, 'এবার তোমার মা-বাবাকে একবার দেখে এসো গে। তোমাকে আমি বেশ বড়ো দেখে একটা শাদা পাঁউরুটি দিচ্ছি—এটা তাঁদের দিয়ো। কত যে খুশি হবেন তাঁরা এতদিন পর তোমাকে দেখে!'

তখন ইঞ্জে পরলে তার সবচেয়ে ভালো পোশাক, পায়ে দিলে নতুন জুতো, তারপর সাবধানে কাপড় সামলে রওনা হল ; আস্তে আস্তে পা ফেলে, পাছে তার নতুন জুতোয় নোংরা লাগে—আর এ-জন্যে তাকে অবিশ্যি দোষ দেয়া যায় না। একটু পরে, পায়ে-চলা পথের শেষে একটা মাঠ, মাঠের এখানে-ওখানে জল-কাদা, তখন ইঞ্জে হাতের পাঁউরুটিটা দিলে কাদায় ছুঁড়ে—ভাবলে, রুটির উপর পা দিয়ে পার হয়ে যাই, পা একটুও ভিজবে না। কিন্তু রুটির উপর এক পা রেখে যেই না সে আর-এক পা তুলছে, অমনি রুটি ডুবতে শুরু করল তাকে নিয়ে—কোথায়, কোথায়, ডুবল নিচে, আরো নিচে, তারপর একেবারে মিলিয়ে গেল, কিছু রইল না, রইল শুধু খানিকটা জল, তা থেকে উঠছে বুদ্বুদ, যেখানে একটু আগে ছিল ইঞ্জে।

এই পর্যন্ত গল্প।

কিন্তু ইঞ্জের কী হল?

সে তলিয়ে গেল মাঠের মধ্য দিয়ে, গেল সোজা শ্যাওড়া-ডাইনির কাছে, সেখানে সব সময় সে তার হাঁড়িকুঁড়িতে কী-কী সব জ্বাল দিচ্ছে। শ্যাওড়া-ডাইনি হল গিয়ে শাঁকচুন্নিদের মামাতো বোন—আর তাদের কথা তো তোমরা জানোই, তাদের নিয়ে কত ছড়া, কত ছবি, কত কিছু! কিন্তু শ্যাওড়া-ডাইনির কথা এটুকু শুধু জানা যায় যে খাঁ-খাঁ মাঠ যখন গরমের দিনের দুপুরে ধোঁয়া উগরোতে থাকে—তার আসল কারণ হচ্ছে এই ডাইনি তার হাঁড়িকুঁড়ি জ্বাল দিচ্ছে। এরই জ্বালখানায় গিয়ে পড়ল ইঞ্জে, আর সেখানে অবিশ্যি কেউ বেশিক্ষণ টিকতে পারে না। কাদার একটা বাক্সও তার তুলনায় রাজপ্রাসাদ। প্রত্যেকটা জালায় এমন বিকট গন্ধ যে কাছে এলেই মূর্ছা যাবার যোগাড়। জালাগুলো আবার গায়ে-গা-লাগা, আর যেখানে বা একটু ফাঁক সেখান দিয়ে আসে যায় কার সাধ্যি! রাজ্যের যত স্যাঁৎসেঁতে কোলাব্যাঙ আর মোটা-মোটা সাপ জায়গা জুড়ে দিব্যি গ্যাঁট হয়ে বসে আছে তো ব'সেই আছে। এরই মধ্যে ইঞ্জে পড়ল গিয়ে ; আর এই বুকে-হাঁটা, ঠোঁট-চাটা, স্যাঁৎসেঁতে জ্যান্ত জানোয়ারগুলোর ভীষণ তাল-পাকানো চেহারা দেখে আঁৎকে উঠল, আর ওগুলোর গায়ের বরফের মতো ঠাণ্ডায় সে শক্ত হয়ে প্রায় জমেই গেল। আটকে রইল সে রুটির সঙ্গে, রুটিটা তাকে টেনে নামাতে লাগল চুম্বক লোহাকে যেমন করে টানে।

শ্যাওড়া-ডাইনি বাড়িতেই ছিল ; তার জ্বালখানায় সেদিন আরো অনেকে বেড়াতে এসেছে। জুজুবুড়ি তার ঠানদিকে নিয়ে (তারও ঠানদি আছে—সে আরো ভয়ানক বুড়ি) এসেছে দেখাশোনা করতে। জুজু-ঠানদি এমন এক বুড়ি যার নিশ্বাসে বিষ ; কখনো সে কাজ ছাড়া থাকে না, যখনই সে বেড়াতে যায়, যায় তার কাজ নিয়েই, সেদিনও নিয়ে এসেছিল। চামচিকের চামড়া দিয়ে বসে-বসে সে জুতো সেলাই করছিল, সে জুতো সে-ই পরবে, সে আর এক মুহূর্ত এক জায়গায় থাকতে পারবে না, কেবলই ঘুরে-ঘুরে বেড়াবে। বুনছিল সে মিথ্যের জাল ; আর রাগের মাথায় বলা যত কথা মাটিতে পড়ে যায়, সব কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে গাঁথছিল মালা—এ-সমস্তই অবিশ্যি মানুষের সর্বনাশ করবার জন্যে। জানত বটে সে বুনতে, গাঁথতে, সেলাই করতে—জুজুবুড়ির এই আরো-বুড়ি ঠানদি !

ইঞ্জেকে দেখতে পেয়েই সে তার ডবল—চশমা চোখে এঁটে মেয়েটাকে ভালো করে দেখে নিলে।

'এ-মেয়ে ধন্যি বটে !' সে বলে উঠল : 'একে দিয়ে দাও না আমাকে—এখানে যে এসেছিলাম তার একটা চিহ্ন থাক। আমার নাতির ঘরের সামনে দাঁড় করিয়ে রাখবার মতো এমন চমৎকার মূর্তি আর পাব না।'

গেল ইঞ্জে জুজু-ঠানদির কাছে, কেমন করে তার ঘরে গিয়ে পৌছল সেটা শোনো। সেখানে একেবারে সোজাসুজি কেউ বড়ো-একটা পৌছয় না ; কিন্তু ইচ্ছে থাকলে অনেক পাক খেয়ে, অনেক পথ হারিয়ে, অনেক ঘুরে-ফিরে শেষ পর্যন্ত পৌছতে পারে গিয়ে।

মস্ত একটা বারান্দার মতো, তা চলেছে তো চলেইছে, কখনো যেন শেষ হবে না। সামনে তাকালে মাথা ঘোরে, পিছনে তাকালে আরো বেশি ঘোরে, দেখা যায় একটা জবড়জং ভিড়, সবাই নিঃশেষে ক্লান্ত—দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে কবে খুলবে দয়ার দরজা—কিন্তু তার যে এখনো অনেক দেরি ! মস্ত মোটা-মোটা পা-ছড়ানো মাকড়শার পাল তাদের পায়ের উপর দিয়ে হাজার বছরের বোনা জাল ছড়িয়ে দিচ্ছে, আর জালগুলো ধারাল তারের মতো কাটে, আর ব্রোঞ্জের বেড়ির মতো তাদের বেঁধে রেখেছে। তা ছাড়া, সকলের বুকের মধ্যেই অশান্তি—নিদারুণ অশান্তি। সেখানে আছে কৃপণ, সে তার সিন্দুকের চাবির কথা ভুলে গেছে, আর কেবলি তার মনে হচ্ছে বুঝি চাবিটা রয়েছে তালার সঙ্গেই লাগানো। আরো যত রকমের যন্ত্রণা সেখানে একত্র জড়ো হয়েছে, সব বলতে গেলে অনেক সময় নেবে। সেখানে ইঞ্জেকে দাঁড়াতে হল মূর্তির মতো, আর দাঁড়াতে গিয়ে ভীষণ ব্যথা লাগল তার—কেননা তার পা যে রুটিতে আটকানো !

'চেয়েছিলাম পা পরিষ্কার রাখতে, তার ফল হল এই', মনে-মনে সে বললে। 'দেখো না সবাই হাঁ করে কেমন আমার দিকে তাকিয়ে !'

সত্যি-সত্যি সকলের চোখই তার দিকে ফেরানো, আর সবগুলো চোখের ভিতর দিয়ে তাদের ভয়-পাওয়া ভুতুড়ে ভাবনাগুলো চকচক করে ফুটে বেরুচ্ছে, আর তারা কী-সব করছে যেন, তাদের ঠোঁট নড়ছে, কিন্তু কোনোরকম একটুও আওয়াজ বেরোচ্ছে না : ভীষণ তারা দেখতে।

ইঞ্জে ভাবলে, 'আমাকে দেখতে বোধ হয় ভাল লাগছে ওদের। আমার মুখখানা তো মন্দ নয়—আর সাজগোজও বেশ ভালো।' এই ভেবে সে চোখ ফেরাল—কিন্তু তার ঘাড় এমন শক্ত হয়ে গেছে যে তা আর ফেরাবার উপায় নেই। কিন্তু এটা সে ভেবে দেখে নি যে তার কাপড়চোপড় সব নোংরা হয়ে গেছে শ্যাওড়া-ডাইনির জ্বালখানায় ; সব একেবারে কাদায় মাখা ; তার চুলের মধ্যে একটা সাপ জড়িয়ে পিঠ দিয়ে নেমে এসে ঝুলছে ; আর তার জামার প্রতিটি ভাঁজে-ভাঁজে মস্ত এক-একটা কোলাব্যাঙ বসে হাঁপানি-ধরা কুকুরের মতো কঁকাচ্ছে। এ তো বড়ো মুস্কিলই হল! 'কিন্তু এখানে অন্য যারা আছে সবাই তো বিকট ভয়ংকর দেখতে', এই কথা ভেবে সে যা-হোক কিছু সান্ত্বনা পেল।

কিন্তু সবচেয়ে মুশকিল হল এই যে নিদারুণ খিদেয় সে একেবারে জ্বলেপুড়ে মরে যাচ্ছিল। কেন, সে তো রুটির উপরেই দাঁড়িয়ে, সে কি পারতো না নিচু হয়ে একটুখানি মুখে তুলতে? কী করে পারবে, তার পিঠ যে একেবারে শক্ত, হাত-পা অবশ, নিঃসাড়, সমস্ত শরীরটা পাথরের একটা স্তম্ভের মতো ; সে পারে শুধু তার মাথার মধ্যে চোখ দুটো ফেরাতে, ঘোরাতে পারে আগাগোড়া, যাতে কিনা পিছনটাও সে দেখতে পায়—আর তখন কী কুৎসিতই তাকে দেখতে হয়! তারপর এল মাছির পাল, সুড়সুড় করে বেয়ে উঠল তার মুখে-চোখে ; তার চোখের পাতা ওঠা-নামা করল অনেকবার—কিন্তু মাছিরা যাবে কেমন করে, তারা তো উড়তে পারে না ; তাদের পাখা যে টেনে ছিঁড়ে ফেলেছে, তারা এখন বুকে-হাঁটা পোকা। খিদের জ্বালার উপর আবার এ-যন্ত্রণা ; আর এমন ভয়ংকর খিদে যে ভিতরটা তার একেবারে খালি লাগছে, একেবারে ফাঁকা, খালি, শূন্য।

'এ-রকম যদি আরো বেশিক্ষণ চলে, তাহলে তো আর বাঁচব না,' সে ভাবলে।

কিন্তু সে মরল না ; আর ঐ রকমই চলল, ঐ রকমই চলল। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত।

তারপর গরম এক ফোঁটা চোখের জল তার মাথার উপর পড়ল, তার মুখের উপর দিয়ে, গলার উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ল, তার পায়ের নিচে পাঁউরুটির উপর। তারপর পড়ল আর এক ফোঁটা, তারপর আরো অনেক ফোঁটার পর ফোঁটা। কে কাঁদছে ইঞ্জের জন্য? এখনো তো পৃথিবীতে তার এক মা আছে। মা ছেলের দুঃখে যত কান্না কাঁদেন সব গিয়ে তার কাছে পৌঁছোয় ; কিন্তু তাতে দুঃখ কমে না, আরো তোলে বাড়িয়ে। এই অসহ্য খিদে কি সয়ে থাকতে হবে, থাকতে হবে রুটির উপর দাঁড়িয়ে অথচ একটু ছুঁতে পারবে না? তার মনে হল সে নিজেকে নিজে খাচ্ছে ; সে

যেন পাৎলা ফাঁপা একটা বাঁশের মতো হয়ে গেছে, সব শব্দ যার মধ্যে গিয়ে বাজে ; কেননা পৃথিবীতে যত লোক তার সম্বন্ধে যত কথা বলছে সব সে শুনতে পাচ্ছে—আর সে-সবই খুব শক্ত কথা, খুব খারাপ কথা। তার মা অবিশ্যি অনেক কান্নাকাটি করলেন তার জন্যে, কিন্তু সেইসঙ্গে এ-ও বললেন, শোনা গেল : 'এমনি করে তুই যে মরবি তা তো জানি। অত দেমাক কি সইবে? বড়ো কষ্ট দিয়েছিস রে ইঞ্জে, তোর মা-র মনে!'

কী ভীষণ অন্যায় সে করেছে তার মা তা জানতেন, জানত সমস্ত দেশ। সে যে রুটি মাড়িয়েছে, তারপর নিচে ডুবে গেছে মিলিয়ে ; এক গয়লা মাঠের ধার দিয়ে যেতে-যেতে তা দেখেছিল।

মা বলতে লাগলেন,—'ইঞ্জে রে, বড়ো কষ্ট দিয়েছিস তোর মা-র মনে। কিন্তু এ-রকম কিছু যে হবে তা তো আমি জানতুমই!'

ইঞ্জে শুনল সে-কথা, আর ভাবলে, 'আমি যদি কখনো না জন্মাতাম তাহলেই সবচেয়ে ভালো হতো। এখন আর মা-র কেঁদে কী লাভ?'

সেই যে কর্তা আর গিন্নিঠাকরুন কত যত্ন করে তাকে রেখেছিলেন, মা-বাপের মতো ছিলেন তাঁরা : আর এখন তাঁরাও বলছেন, 'মেয়েটার মনে এত পাপ ছিল, ঈশ্বরের উপহার সে নিতে পারে নি, মাড়িয়েছিল রুটি, দয়ার দরজা তার দিকে সহজে খুলবে না।'

'কেন ওঁরা আমাকে আগেই শাস্তি দেন নি?' ভাবলে ইঞ্জে। 'তাহলেই তো এ-সব বদখেয়াল সারতো!'

তারপর সে শুনতে পেল একটা গান, আস্ত গান একটা, তাকে নিয়েই তৈরী। এক দেমাকি মেয়ে জুতো পরিষ্কার রাখবার জন্যে রুটি মাড়িয়েছিল! সে শুনল সেই গান সবখানে মুখে-মুখে গাওয়া হচ্ছে।

ইঞ্জে ভাবলে,—'তার জন্যে কি আমার এত কঠিন শাস্তি? হোক, হোক, অন্য সকলেও শাস্তি পাক যার-যার পাপের। তাহলে চারদিকে শাস্তির একেবারে ছড়াছড়ি। উঃ, লাগছে, কী ভীষণ লাগছে!'

তারপর তার হৃদয় বাইরের চেহারার চেয়েও আরো শক্ত হয়ে গেল।

ইঞ্জে ভাবলে, 'এদের মধ্যে থেকে এর চেয়ে ভালো কী করে হয়! চাইনে, চাই নে আমি ভালো হতে। দেখো, দেখো, সবাই আমার দিকে কেমন করে তাকাচ্ছে!' আর সব মানুষের বিরুদ্ধে ঘৃণায় বিদ্বেষে সে জ্বলে উঠল। 'যাক—এতদিনে ওদের কথা বলবার মতো কিছু হল বটে! উঃ, কী কষ্ট! কী কষ্ট!'

তারপর সে শুনল, ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়েদের তার গল্প বলে শোনানো হচ্ছে, আর ছোটোরা তাকে বলছে শয়তানি ইঞ্জে, বলছে সে যখন এত পাজি, আর এত কুচ্ছিৎ তার খুব শাস্তি হওয়াই উচিত।

ছোটদের মুখ দিয়ে পর্যন্ত তার সম্বন্ধে শক্ত কথা বেরোতে লাগল।

কিন্তু একদিন, যখন খিদের আর কষ্টের জ্বালা তার ফাঁপা শরীরটাকে চিবিয়ে খাচ্ছে, সে শুনলে কে তার নাম বলছে, বলছে তার গল্প ছোট্ট একটি মেয়েকে, অবোধ শিশুকে, আর এই উদ্ধত অহংকারী মেয়ের গল্প শেষ পর্যন্ত শুনে সে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

'আর কি ইঞ্জে উপরে উঠে আসবে?' সে জিগেস করলে।

উত্তর হল ঃ 'না, আর আসবে না।'

'কিন্তু সে যদি ক্ষমা চায়, যদি বলে এমন আর-কখনো করবে না, কক্ষনো না?'

'তা'লে আসতে পারে বটে, কিন্তু ক্ষমা সে কখনো চাইবে না।'

ছোটো মেয়েটি বলতে লাগল : 'আহা—সে ক্ষমা চাইলেই তো পারে। আমি তাহলে খুশি হই।' কিছুতেই সে যেন শান্ত হয় না, কেবলি বলে—'আমার সব পুতুল, সব খেলবার জিনিস দিয়ে দিতে পারি আমি—যদি তাতে সে উঠে আসে। বেচারা ইঞ্জে— কত যেন কষ্ট পাচ্ছে!'

আর এই কথাগুলো ইঞ্জের বুকের একেবারে মধ্যিখানে ফুঁড়ে বিঁধে গেল, আর তাতে যেন তার ভালোই হল। এই প্রথম কেউ তাকে দয়া করলে, দোষের কথা কিছু মনে না রেখে একটু আহা-বেচারা বললে : অবোধ কোন শিশু কাঁদছে তার জন্য, তার জন্য দয়া ভিক্ষা করছে দেবতার কাছে। ভারি অদ্ভুত লাগল ইঞ্জের, তারও ইচ্ছে করল কাঁদতে, কিন্তু কান্না এল না তার, সেও আর একটা যন্ত্রণা হয়ে উঠল।

এদিকে তার উপর দিয়ে বছরের পর বছর কেটে যাচ্ছে, সে যেখানে আছে সেখানে তো কিছু বদলায় না, ক্রমেই তার সম্বন্ধে সে কম কথা শুনতে লাগল, আরো কম। শেষটায় একদিন তার কানে একটা দীর্ঘশ্বাস এসে বিঁধল : 'ইঞ্জে, কী কষ্ট আমাকে দিলি! কিন্তু আমি তো আগেই জানতুম!' তার মা মারা গেলেন, এ তাঁর শেষ দীর্ঘশ্বাস।

কখনো-কখনো সেই জমিদার আর গিন্নিঠাকরুনের মুখে সে শুনত তার নাম। ঠাকরুন বলতেন, 'কে জানে ইঞ্জেকে আর কখনো দেখবো কিনা! কখন কী হয় কে জানে!'

কথাগুলো শুনতে ভালো, কিন্তু ইঞ্জে জানত যে সে যেখানে আছে সেখানে সেই লক্ষ্মী মা-ঠাকরুন কখনোই আসবেন না।

সময় কাটতে লাগল—কী দীর্ঘ, কী তিক্ত সময়! তারপর ইঞ্জে আর একবার শুনল তার নাম, চেয়ে দেখল তার মাথার উপরে দুটো তারা যেন জ্বলজ্বল করছে। দু'টি কোমল চোখ পৃথিবীতে বুজে এল। সেই যে ছোটো মেয়েটি 'আহা ইঞ্জে' বলে অশান্ত হয়ে কেঁদেছিল, তারপরে এতদিনই কেটে গেছে যে সেই শিশু গেছে বুড়ো হয়ে, এতদিনে তার ডাক পড়েছে স্বর্গের গৃহে ; আর শেষ নিশ্বাসের সময়—যখন সমস্ত জীবনের ঘটনাগুলো এক মুহূর্তে ভিড় করে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়—

তখন বৃদ্ধার মনে পড়ল সে যে শিশু বয়েসে ইঞ্জের গল্প শুনে আকুল হয়ে কেঁদেছিল।

তারপর বুজল বৃদ্ধার চোখ, সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর ভিতরের চোখ গেল খুলে, লুকানো জিনিস তিনি দেখতে পেলেন। তাঁর শেষ মুহূর্তে কিনা ইঞ্জে ছিল স্পষ্ট হয়ে ফুটে, তিনি তাই দেখতে পেলেন কত নিচে নেমেছে ইঞ্জে, কোন্ পাতালে ডুবেছে, দেখে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। স্বর্গে গিয়ে তিনি দাঁড়ালেন শিশুর মতো, কাঁদলেন ইঞ্জের জন্য। আর এই কান্না আর প্রার্থনা ইঞ্জের নির্যাতিত বন্দী আত্মার চারদিককার শূন্য অন্ধকারে প্রতিধ্বনির মতো ফুঁপিয়ে বেজে উঠল ; উপর থেকে নেমে এল তার বুকে অপূর্ব ভালবাসা—কেন? না, এক দেবদূত কাঁদছে তার জন্যে। এতদিন পরে কেন তাকে দয়া? এত কষ্ট সে পেয়েছে—এত কষ্টের মধ্যে আজ তার মনে পড়ছে যত অন্যায় পৃথিবীতে সে করেছিল, আর সে ইঞ্জে আজ থরথর করে কাঁপছে আর এমন কান্না কাঁদছে, কখনো সেরকম কাঁদেনি। নিজের জন্যে কষ্টে বুক তার ভরে গেল : তার মনে হল দয়ার দরজা কখনোই তার জন্যে খুলবে না ; —আর গভীর অনুতাপে যেই সে এ-কথা স্বীকার করলে, অমনি একটি আলোর রেখা ঝলমল করে তার একেবারে ভিতরটায় গিয়ে ফুটল—প্রচণ্ড তার তেজ, যেন সূর্যের আলোয় গলে গেল শিশুদের তৈরী বরফের বাড়ি। আর যত দ্রুত বরফের পাপড়ি গলে যায়, গলে গিয়ে শিশুর উষ্ণ ঠোঁটে জলের ফোঁটা হয়ে পড়ে, তেমনি তাড়াতাড়ি বদলে গেল ইঞ্জের পাথরমূর্তি, হয়ে গেল কুয়াশা, তারপর ছোট্ট একটা পাখি বিদ্যুতের মতো ঝলসিয়ে উড়ে গেল উপরে, মানুষের পৃথিবীতে। কিন্তু পাখিটি ভারি ভীরু, ভারি লাজুক, নিজের সম্বন্ধে তার বড়ো লজ্জা, জীবন্ত কিছুর সঙ্গে দেখা হবে বলে তার বড়ো ভয় ; তাড়াতাড়ি সে একটা বুড়ো পোড়ো-পোড়ো দেয়ালের ফুটোয় গা-ঢাকা দিলে। চুপটি করে লুকিয়ে বসে রইল সেখানে, সমস্ত শরীর কাঁপছে, একটু আওয়াজ বার করতে পারলে না গলা দিয়ে—তার তো স্বর নেই! চারদিকে সবই সুন্দর, কিন্তু অত সুন্দর! ভাল করে দেখতে অনেক সময় লাগল তার। বইছে গরম টাটকা হাওয়া, চাঁদ পৃথিবীর উপর তার মধুর আলো দিচ্ছে ছড়িয়ে, কী মিষ্টি গন্ধ ঝোপে-ঝাড়ে গাছে-পাতায় ; আর কী সুন্দর জায়গায় সে বসেছে, কী নির্মল, কোমল তার পালকের জামা! সমস্ত সৃষ্টি দয়ার আর দাক্ষিণ্যের কথা কয়ে উঠছে। পাখি বলতে চাইল তার মনের কথা, বলতে পারলে না ; আহা—কেন সে গান গাইতে পারে না, কোকিল-দোয়েল যেমন গান গায় বসন্তে! কিন্তু বোবার স্তবও তো স্বর্গে গিয়ে পৌছয় ; তার বুকের মধ্যে কাঁপছিল স্তবের যে-সুর, তাও স্বর্গ শুনল।

অনেকদিন এই বোবা গান কাঁপল বুকে ; তারপর বড়োদিন এল। কাছাকাছি থাকত এক চাষা ; সে এক উঁচু বাঁশের মাথায় কতগুলো ধানের শিষ বেঁধে দেয়ালের

গায়ে দাঁড় করিয়ে রাখল, আকাশের পাখিরা যাতে পেট ভরে খেতে পারে। এমন সুখের সময়ে তারাও সুখী হোক।

বড়োদিনের সকালে সূর্য উঠল ধানের শিষের উপর ঝিলিমিলি আলোয়, চারদিকে অনেক পাখি চ্যাঁচামেচি করে ঘুরছে। তখন দেয়ালের একটা গর্ত থেকে স্রোতের মতো আর একটা পাখির কণ্ঠস্বর বেরিয়ে এল, আর সেই পাখি তার লুকোবার জায়গা থেকে বেরিয়ে উড়ে গেল আকাশে ; আর স্বর্গে সবাই জানল পাখিটা কে।

বড়ো দারুণ শীত পড়ল পুকুরগুলো গেল বরফে ঢেকে ; মাঠের পশুরা আর আকাশের পাখিরা খেতে না পেয়ে প্রায় মরে গেল। আমাদের ছোট্ট পাখিটি গেল বড়ো রাস্তার উপর দিয়ে উড়ে, এখানে-ওখানে সে দেখে ধানের শিষ, ছাতুর ঘুরো, কিন্তু নিজে সে অল্পই খায়, অন্য সব খিদে-পাওয়া পাখিদের ডেকে-ডেকে খাওয়ায়। সে ঘুরল শহরে-শহরে : আর যেখানেই কেউ দয়া করে জানলার উপর পাখিদের জন্যে এক টুকরো রুটি রাখে, সে শুধু অল্প একটু খায়, বাকি সমস্তটা অন্য পাখিদের দিয়ে দেয়।

সমস্তটা শীত ভরে পাখি এত সব রুটির টুকরো কুড়োল, দিয়ে দিলে অন্য পাখিদের, যেগুলো একত্র হয়ে ওজনে ঠিক সেই রুটিটার সমান হল, জুতো পরিষ্কার রাখবার জন্যে যে-রুটিটা ইঞ্জে মাড়িয়েছিল ; আর যখন শেষ রুটির টুকরোটি দেওয়া হয়ে গেল, শাদা হয়ে গেল পাখির ছাই রঙের পাখা, ছড়িয়ে পড়ল অনেক দূরে।

সেই শাদা পাখি দেখে ছোটো ছেলেরা বললে : 'ওই দেখো জলের উপর দিয়ে একটা গাংচিল উড়ে যাচ্ছে।' এই সে ডুব দিচ্ছে সমুদ্রের জলে, এই সে উঠে আসছে পরিষ্কার দিনের আলোয়। আলোর ঝলক তুলে কোথায় উড়ে গেল এই শাদা পাখি কেউ তা জানে না, যদিও কেউ কেউ জোর করেই বলে যে সে সোজা সূর্যের মধ্যে উড়ে চলে গেছে।

আঙুলিনা

এক ছিল বৌ।

বৌটি ভাবে—আহা, আমার যদি ছোট্ট একটা মেয়ে থাকত। কিন্তু কোথায় মেয়ে পাবে সে জানে না। তাই সে গেল গাঁয়ের বুড়ি ডাইনির কাছে, গিয়ে বললে :

'ছোট্ট একটি মেয়ে আমি চাই। বলতে পারো কোথায় গেলে মিলবে?'

'তা আর বেশি কথা কী', ডাইনি জবাব দিলে। 'এই নাও একটা যবের শিষ—এ যে-সে যব নয়, ঘাটে-মাঠে যা গজায়, পাখিরা যা ঠুকরে-ঠুকরে খায়। এটা নিয়ে রাখো একটা ফুলের টবে, তারপর দেখো কী হয়।'

বৌটি কৃতার্থ হয়ে বললে, 'অনেক উপকার করলে!' বলে ডাইনির হাতে বারোটি টাকা দিলে—কেননা বারো টাকা এর দাম।

বাড়ি ফিরে এসে সে ফুলের টবে যেই যবের শিষ লাগাতে পেরেছে, অমনি সেখানে লাফিয়ে উঠল মস্ত সুন্দর একটা ফুল—অনেকটা সূর্যমুখীর মতো দেখতে। কিন্তু পাপড়িগুলো বোজানো, যেন ফুল এখনো কুঁড়ি।

'সুন্দর ফুল তো!' বলে বৌটি জ্বলজ্বলে হলদে পাপড়িগুলোতে চুমো খেল। আর যেই চুমো খাওয়া, অমনি—ফট্! ফুটে উঠল ফুল, সত্যিকারের সূর্যমুখী, এখন দেখলেই চেনা যায়। আর ফুলের মধ্যিখানে সবুজ মখমলের বিছানায় ছোট্ট একটি মেয়ে—কী তুলতুলে নরম, আর কী ফুটফুটে দেখতে! টেনে-টুনে সে আধ-আঙুল উঁচু—আর তাও বুড়ো আঙুলের আধ-আঙুল।

পরিষ্কার ঝকঝকে একটি বাদামের খোশা হল তার দোলনা, নীল অপরাজিতা তার তোশক, লাল গোলাপের পাপড়ি তার লেপ। সেখানে রাত্রে সে ঘুমোয়—আর দিনের বেলায় টেবিলে বসে সে খেলা করে। বৌটি একটি থালায় ফুলের তোড়া বসিয়ে জল দিয়ে ভরে রাখে, ফুলের ডাঁটাগুলো জলের ভিতরে গিয়ে পড়ে, জলে ভাসে একটা সূর্যমুখীর পাপড়ি, তার মধ্যে বসে আঙুলিনা সরু দু' টুকরো চুল দিয়ে দাঁড় বায়—তার নৌকো ভেসে চলে কখনো থালার এদিকে, কখনো ওদিকে। ভারি সুন্দর হয় তখন দেখতে। গান করতেও পারে আঙুলিনা—এমন মিষ্টি গলা যে কখনো সে-রকম গান শোনা যায় নি।

একদিন হয়েছে কী, সে তো শুয়ে আছে তার ছোট্ট টুকটুকে বিছানায়—এদিকে জানালার একটা কাচ ছিল ভাঙা, সেখান দিয়ে সুড়সুড় করে এসে ঢুকল মস্ত একটা কোলাব্যাঙ—যেমন বিশ্রী দেখতে, তেমন স্যাঁৎসেঁতে ছুঁতে। থপথপ করে সে সোজা একেবারে টেবিলের উপর উঠে এল, যেখানে গোলাপের লেপ মুড়ি দিয়ে আঙুলিনা ঘুমুচ্ছে।

কোলাব্যাঙ—আসলে সে ব্যাঙ্গমী—ভাবলে, 'বাঃ, মেয়েটি ছেলের খাশা বৌ হবে আমার!' এই না ভেবে সে বাদামে ঘুমানো আঙুলিনাকে খোশাসুদ্ধ তুলে নিয়ে থপথপ করে বেরিয়ে গেল জানলা দিয়ে বাগানে।

মস্ত চওড়া একটা খালের ধারে নরম স্যাঁৎসেঁতে কাদা, সেখানে ব্যাঙ্গমা থাকে ছেলেকে নিয়ে। উঃ—ছেলেটা কী কুৎসিত দেখতে, ঠিক তার মায়েরই মতো! বাদামের খোশায় শোয়ানো ছোট্ট ফুটফুটে মেয়েটিকে নিয়ে তার মা আসছে, এই দেখতে পেয়ে সে বলে উঠল : 'ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙর! ঘ্যাঙ-ঘ্যাঙর!' এর বেশি আর কিছু বলতে পারলে না।

বুড়ি ব্যাঙ্গমী বললে, 'অত জোরে চ্যাঁচাসনি—হঠাৎ জেগেই ওঠে যদি! কখন পালিয়ে যাবে টেরও পাবি নে, একটুখানি পালকের মতো তো উনি হালকা! খালের মধ্যে চওড়া দেখে একটা শাপলা পাতায় শুইয়ে রাখি ওকে। ওই তো এক ফোঁটা মিরকুট্টে মানুষ, ওর পক্ষে ও-ই একটা দ্বীপ, সেখান থেকে পালাতে পারবে না। ততক্ষণে কাদার নিচের বড়ো বাড়িটা গুছিয়ে ফেলি—তোরা দু'জনে তো সংসার পাতবি সেখানে।'

খালের মধ্যে অনেক শাপলা সবুজ চওড়া পাতা ছড়িয়ে দিয়েছে—দেখে মনে হয় যেন জলের উপর ভাসছে। সবচেয়ে দূরে যে-পাতাটা-সেটাই সবচেয়ে বড়ো, বুড়ি ব্যাঙ্গমী সাঁতরে গিয়ে তারই উপর সোয়ালো আঙুলিনাকে, তার বাদাম-খোশা সুদ্ধ। ছোট আঙুলিনা ভোরবেলা জেগে উঠেই ভয়ানক কাঁদতে লাগল—ওমা! সে কোথায় এসেছে, চারদিকে যে জল, কেমন করে ডাঙায় যাবে সে! এদিকে বুড়ি ব্যাঙ্গমী ঘন কাদার মধ্যে থপথপ করতে করতে শ্যাওলা আর কচুরি-ফুল দিয়ে ঘর সাজাচ্ছে—নতুন বৌ আসবে, ঘর-দোরের লক্ষ্মীশ্রী না-হলে কি চলে! তারপর সে তার কুৎসিত ছেলেটাকে নিয়ে সাঁতরে গেল আঙুলিনার কাছে। তার বিছানাটা নিয়ে এসে আগে পেতে রাখতে হবে তো!

বুড়ি ব্যাঙ্গমী আঙুলিনার কাছে গিয়ে গম্ভীর স্বরে বললে, 'এই আমার ছেলে, এর সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে—দু'জনে খুব সুখে থাকবে কাদার নিচে চমৎকার বাড়িতে।'

'ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর! ঘ্যাঙ ঘ্যাঙ ঘ্যাঙর!' এর বেশি ছেলেটা কিছু বলতেই পারলে না।

ছোট টুকটুকে বিছানা নিয়ে তারা তো সাঁতরে চলে গেল ; এদিকে আঙুলিনা সবুজ পাতার উপর বসে-বসে কাঁদতে লাগল। ছি-ছি, শেষটায় কি এই নোংরা ব্যাঙ্গমীর বাড়িতে থাকতে হবে, বিয়ে করতে হবে তার বিদঘুটে ছেলেটাকে!

ওদিকে হয়েছে কী, জলের নিচে যত ছোটো-ছোটো মাছ সাঁতরে বেড়াচ্ছে, তারা দেখেওছিল বুড়ি ব্যাঙ্গমীকে, শুনেওছিল তার কথা—তাই এখন ফাঁক পেয়ে ছোট্ট মেয়েটিকে দেখবে বলে তারা মুখ তুলল। আর তাকে দেখেই তাদের এত ভালো লাগল যে এরই সঙ্গে সেই ক্যাবলা কুৎসিত ব্যাঙটার বিয়ে হবে ভেবে দস্তুরমতো মন-খারাপ হয়ে গেল তাদের। নাঃ—কিছুতেই তারা তা হতে দেবে না। আঙুলিনা

যে পাতাটার উপর বসে কাঁদছিল, জলের নিচে তার চারদিকে তারা সবাই জড়ো হল, তারপর ছোটো-ছোটো ধারাল দাঁত দিয়ে কুটকুট করে ডাঁটাটা দিলে কেটে। আলগা হয়ে গেল পাতা, ভেসে চলল জলের স্রোতে, ভেসে গেল আঙুলিনা অনেক, অনেক দূরে, বুড়ি ব্যাঙ্গমীর নাগালের বাইরে।

আঙুলিনা ভেসে চলল, অনেক শহর পার হয়ে, আর ঝোপের উপর বসে ছোটো-ছোটো পাখিরা তাকে দেখলে, দেখে ভাবলে, 'বাঃ কী সুন্দর মেয়েটি!' ভেসে চলল শাপলা-পাতাটি আরো অনেক দূরে—শেষটায় আঙুলিনা চলে গেল একেবারে দেশ ছাড়িয়ে।

ছোট্ট সুন্দর এক শাদা প্রজাপতি তার সঙ্গে-সঙ্গে ফুরফুর করে উড়ে-উড়ে আসছিল, এতক্ষণে নেমে বসল সে পাতার উপর। আঙুলিনাকে দেখে তার ভালো লেগেছিল—আর আঙুলিনাও এখন খুব খুশি, এখন তো আর ব্যাঙ্গমী বুড়ি তাকে ধরতে পারবে না! আর কী সুন্দর—যেখান দিয়ে সে এখন ভেসে যাচ্ছে—জলের উপর রোদ ঝকঝক করছে, জলগুলো ঝিলকিয়ে উঠছে পাকা সোনার মতো। কাপড় থেকে একটু সুতো বার করে নিয়ে সে প্রজাপতির সঙ্গে পাতাটাকে বাঁধল। পাতা ভেসে চলল আগের চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি, ভেসে চলল আঙুলিনা সেই সঙ্গে, যেহেতু পাতার উপরেই সে দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ কোত্থেকে মস্ত একটা বোলতা এল উড়ে, তাকে দেখতে পেয়েই শুঁড় দিয়ে আঁকড়ে ধরল তার সরু কোমর, তারপর তাকে নিয়ে গিয়ে বসল একটা গাছের উপর। সবুজ পাতাটা চলল খালি খালি ভেসে, সঙ্গে চলল প্রজাপতি—সে তো পাতার সঙ্গে বাঁধা, এখন ছাড়াবে কী করে?

মাগো! কী ভয়ই না পেয়েছিল আঙুলিনা, বোলতাটা যখন তাকে নিয়ে উড়ে গিয়ে গাছের মাথায় বসল! কিন্তু সবচেয়ে তার কষ্ট হল সুন্দর শাদা প্রজাপতিটার জন্য। সে-ই তো তাকে অমন করে বেঁধেছিল, এখন ছাড়াতে যদি না পারে তাহলে হয়তো বেচারা না-খেয়েই মরবে। বোলতাটা কিন্তু এত সব কিছুই ভাবলে না। সে দিব্যি আঙুলিনাকে নিয়ে গাছের সবচেয়ে বড়ো সবুজ পাতাটার উপর গ্যাঁট হয়ে বসল, খেতে দিলে আঙুলিনাকে ফুলের মধু, তারপর বললে সে দেখতে বেশ ভালো, যদিও বোলতাদের মতো মোটেই নয়। খানিক পরে পাড়া-পড়শি বোলতারা বেড়াতে এল, আঙুলিনাকে দেখে তারা বললে :

'ওমা, এ কী চেহারার ছিরি, দুটো মোটে ঠ্যাং!'

'একটা হুল পর্যন্ত নেই!'—আর-একজন বললে।

'কী সরু মাজা—ছি! দস্তুরমতো ঐ দু'পেয়ে মানুষগুলোর মতোই তো দেখতে! মাগো!' এ-কথা বলে মেয়ে-বোলতারা সব শিউরে উঠল।

আসলে আঙুলিনা কিন্তু সত্যি খুব সুন্দর। যে-বোলতাটা তাকে নিয়ে এসেছিল তারও মনে হয়েছিল তাই। কিন্তু অন্য সবাই যখন বললে যে ওটা দস্তুরমতো

কুৎসিত, সে-ও তা-ই বিশ্বাস করে বসল। আঙুলিনাকে আর সে কাছে রাখবে না কিছুতেই—যাক সে চলে যেখানে তার খুশি। ওকে নিয়ে গাছ থেকে নামল সবাই, চলে গেল ওকে একটা চাঁপা ফুলের উপর বসিয়ে রেখে। সেখানে বসে বসে অনেকক্ষণ কাঁদলে সে—সে কিনা এতই কুৎসিত যে বোলতারাও তাকে কাছে রাখবে না! আর আসলে কিন্তু তার চেয়ে সুন্দর কোনো-কিছু ভাবতেও পারবে না তোমরা—গোলাপের পাপড়ির মতো সে নরম আর হালকা।

বেচারা সমস্তটা গ্রীষ্ম একা-একা কাটাল সেই মস্ত বনের মধ্যে। বুনল সে বিছানা ঘাসের গুচ্ছ দিয়ে, ঝুলিয়ে দিলে চাঁপা গাছের নিচে—রোদ বৃষ্টি থেকে তবু বাঁচল। ফুলের মধু খেয়ে সে রইল বেঁচে ; আর রোজ সকালে পাতার উপর যে শিশিরটুকু জমে, তা-ই তার তৃষ্ণার জল। এমনি করে কাটল গ্রীষ্ম, কাটল শরৎ—তারপর এল শীত, লম্বা, ঠাণ্ডা শীতকাল। যে-পাখিরা এতদিন তাকে কত মিষ্টি গান শুনিয়েছে, কোথায় উড়ে গেল তারা ; ঝরল ফুল, ঝরল গাছের পাতা ; তার মস্ত চাঁপা গাছটা শুকিয়ে হলদে একটা ডাঁটের মতো হয়ে গেল—আর কী ভীষণ শীত! জামা-কাপড় তার সব ছেঁড়া, আর এমন হালকা সে, এমন নরম—বেচারা আঙুলিনা! শীতে সে প্রায় জমে গেল। শুরু হল বরফ পড়া ; আর তার গায়ে যদি একটি কুচি বরফ পড়ে, সে আমাদের গায়ে বরফের আস্ত এক-একটা ঢিপি ভেঙে পড়ার মতো—কেননা আমরা কত লম্বা, সে হয়ত টেনেটুনে এক ইঞ্চি। কী আর করা—শুকনো একটা পাতা মাঝখান দিয়ে চিরে নিয়ে সে গায়ে জড়াল—কিন্তু তাতে কি শীত মানে! হি-হি করে কাঁপতে লাগল সে।

বনের কাছে মস্ত একটা ধানখেত—এখন অবিশ্যি আর ধান নেই, শুকনো খড় উঁকি মেরে রয়েছে বরফের উপর দিয়ে। সেখানে আঙুলিনা ঘুরে বেড়ালে—তার পক্ষে বিশাল ঘন বন সেটা, আর, উঃ, কী তার শীতে কাঁপুনি! ঘুরতে-ঘুরতে সে এসে উপস্থিত হল মেঠো ইঁদুরের দরজায়। মাটির তলায় এই ইঁদুরের বাসা। সেখানকার গরমে পরম আরামে সে থাকে, আস্ত একটা ঘর ভরা তার ধান—আর কী তার ভাঁড়ার আর রান্নাঘরের ঘটা! বেচারা আঙুলিনা ঠিক ভিখিরির মতো তার দরজায় এসে দাঁড়াল—একটু চালের গুঁড়ো যদি সে পায়, দু'দিন সে একফোঁটা কিছু খায় নি।

মেঠো ইঁদুর বুড়োমানুষ, যে যা-ই বলুক, লোক সে নেহাৎ মন্দ নয়। আঙুলিনাকে দেখে সে বললে, 'আহা বাছা! এসো, এসো, আমার ঘর বেশ গরম, আমার সঙ্গে কিছু খাও এসে।'

আঙুলিনার সঙ্গে আলাপ করে খুশি হয়ে সে বললে, 'তা বাছা, ইচ্ছে করলে শীতটা আমার এখানেই কাটাতে পারো। এই ঘরদোরগুলো একটু ঝাঁট দেবে, আর বসে বসে আমায় গল্প শোনাবে—গল্প শুনতে আমি বেজায় ভালবাসি।'

আঙুলিনা বুড়ো ইঁদুরের কথামতো কাজ করল, সময়টা তার ভালোই কাটল।

একদিন বুড়ো ইঁদুর বললে, 'শোনো বাছা, আজ বাড়িতে একজন বেড়াতে আসবেন। সপ্তাহে একদিন আমার এই বন্ধুটি আমার বাড়িতে আসেন—মস্ত লোক তিনি, আমার চেয়েও বড়োলোক। তাঁর বাড়িতে মস্ত বড়ো-বড়ো ঘর, তাঁর গায়ে কাল কুচকুচে মখমলের কোট। ইনি যদি তোমাকে বিয়ে করেন তাহলে তোমার আর কোনো ভাবনা থাকে না। ইনি এলে যত পারো ভালো-ভালো গল্প শোনাবে।'

কিন্তু এ-সব কথা আঙুলিনার গায়েই লাগল না ; ইঁদুরের বন্ধুকে আমলেই আনলে না সে, কেননা বন্ধুটি আর কেউ নয়, একটা ছুঁচো। ছুঁচো এল বেড়াতে তার কুচকুচে কাল মখমলের কোট পরে। ইঁদুর আঙুলিনাকে ডেকে অনেক বোঝাল—ছুঁচো কী বড়োলোক আর কী বিদ্বান, তার বাড়ি কম-সে-কম এ-বাড়ির কুড়িগুণ বড়ো ; মহাপণ্ডিত সে, কিন্তু সূর্যের আলো, কি সুন্দর তাজা ফুল সে একেবারেই পছন্দ করে না—কেননা সে-সব কখনো দেখেনি।

আঙুলিনার গান করতে হল ঃ সে গাইল,

'উড়ে যাও বোলতা
বদলিয়ে ভোলটা,'

আর গাইল,

'কী হল রে দস্যি, আ মর!
চামচিকে বুঝি দিল কামড়।'

তার গলার মিষ্টি আওয়াজ শুনেই ছুঁচোর তাকে পছন্দ হয়ে গেল ; কিন্তু মুখে সে কিছু বললে না, কেননা সে বড়ো গম্ভীর ছুঁচো।

কিছুদিন আগে সে মাটির তলা দিয়ে তার বাড়ি থেকে ইঁদুরের বাড়ি পর্যন্ত লম্বা একটা সুড়ঙ্গ খুঁড়ে ফেলেছিল ; এখন সে ইঁদুরকে আর আঙুলিনাকে সেই রাস্তা দিয়ে যত খুশি যাওয়া-আসা করবার অনুমতি দিলে। সেই সঙ্গে এ-ও বললে, 'রাস্তার মধ্যে মরা একটা পাখি পড়ে আছে—তাকে দেখে ভয় পেয়ো না কিন্তু।' আস্ত একটা পাখি, পাখা ঠোঁট সব সুদ্ধ, বেশি দিন মরে নি নিশ্চয়ই, এখন পড়ে আছে ঠিক ছুঁচোর রাস্তার উপরে।

ছুঁচো মুখে নিলে এক টুকরো পচা কাঠ, অন্ধকারে আগুনের মতো তা ঝিলমিলিয়ে উঠল, তারপর আগে-আগে চলল সেই লম্বা কাল সুড়ঙ্গ পথ দেখিয়ে। মরা পাখিটার কাছে এসে ছুঁচো তার চওড়া থ্যাবড়া নাকটা দিয়ে সুড়ঙ্গের ছাদে কয়েকবার ঘষা দিলে-খানিকটা মাটি খসে গর্ত হয়ে গেল, উঁকি মারলে একটু দিনের আলো। মেঝের উপর পড়ে আছে মরা একটা সোয়ালো পাখি, তার সুন্দর ডানা বুকের উপর ঘন করে গুটানো, মাথা আর পা পালকের মধ্যে গোঁজা—বেচারা নিশ্চয়ই ঠাণ্ডায় মারা গেছে। বড়ো মায়া হল আঙুলিনার তাকে দেখে ; ছোটো-ছোটো পাখিরা তাকে গান শুনিয়েছে সমস্ত গ্রীষ্ম ভরে—বড়ো ভালবাসে সে তাদের। কিন্তু ছুঁচো তার বাঁকা-বাঁকা পা দিয়ে পাখিটাকে এক লাথি মেরে বললে, 'কেমন! আর

কি চিঁ চিঁ করে! কত পাপ করলে কেউ পাখি হয়ে জন্মায়! ভাগ্যিস আমার ছেলেপুলেরা কেউ পাখি হবে না! ওগুলোর আর তো কোনো কাজ নেই—সারাদিন শুধু চিঁ চিঁ ক'রবে, আর শীতকালে মরবে উপোস করে!

ইঁদুর তৎক্ষণাৎ সায় দিলে, 'আপনি এত বড়ো পণ্ডিত—ঠিকই বলেছেন। এত সব চিঁ-চিঁ, পিঁ-পিঁ শীত এলে কোন কাজে লাগে বলুন দেখি? তখন তো না-খেয়ে জ'মে মরতে হয়। তবু লোকে বলে পাখিদের নাকি মস্ত বড়ো ঘর!'

আঙুলিনা কিছু বললে না, কিন্তু ওরা দুজন যেই পিঠ ফেরাল সে নিচু হয়ে পাখিটার মাথা থেকে পালক সরিয়ে ওর বোজা চোখে একবার চুমু খেল।

'ও-ই হয়তো গ্রীষ্মকালে এত মিষ্টি গান আমাকে শুনিয়েছে', সে ভাবলে। 'আহা রে, কত আনন্দ ও দিয়েছে আমাকে—লক্ষ্মী মিষ্টি পাখিটি!'

ছুঁচো ছাদের গর্তটা দিলে বুজিয়ে, দিনের আলো গেল মিলিয়ে, তারপর সে ইঁদুরকে আর আঙুলিনাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে বিদায় নিলে। কিন্তু সে-রাত্রে আঙুলিনা একেবারেই ঘুমোতে পারলে না। বিছানা থেকে উঠে সে বসে বসে মস্ত সুন্দর একটা খড়ের গালিচা তৈরী করে ফেলল, তারপর বুড়ো ইঁদুরের ঘর থেকে যোগাড় করলে পেঁজা তুলোর মতো নরম কতকগুলো শুকনো ফুলের পাপড়ি। তারপর মরা সোয়ালোর কাছে গিয়ে সে বিছিয়ে দিলে তার উপর গালিচা, বুকে-পিঠে গুঁজে দিলে শুকনো পাপড়ি।

'ছোট্ট মিষ্টি পাখিটি', আঙুলিনা বললে, 'এখন তবে আসি। গ্রীষ্মকালে কত সুন্দর গান তুমি শুনিয়েছ, তা আমি ভুলি নি। তখন গাছগুলো ছিল সবুজ, আকাশ ভরে ছিল রোদ।' এই বলে সে তার বুকের উপর রাখলে পাখিটার মাথা। কিন্তু পাখিটা আসলে মরে নি, ঠাণ্ডায় নিঃসাড় হয়ে গিয়েছিল—এখন গরম পেয়ে আবার উঠল বেঁচে।

শীত যেই পড়তে আরম্ভ করে, সোয়ালো পাখিরা ঝাঁকে-ঝাঁকে উড়ে যায় গরম দেশের দিকে ; কিন্তু তাদের মধ্যে একজনের যদি রওনা হতে দেরি হয়ে যায়, তাহলে পথের মধ্যেই নামে শীত, শীতে জ'মে গিয়ে সে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে, যেন মরে গেছে, তারপর ঠাণ্ডা বরফ তাকে ঢেকে ফেলে।

আঙুলিনা চমকে প্রায় কেঁপে উঠল, কেননা পাখিটা তার তুলনায় মস্ত, প্রকাণ্ড বড়ো, সে কিনা টায়ে-টুয়ে এক ইঞ্চি! তবু সে সাহস করে গালিচাটা আরো ঘন করে তার গায়ে জড়াল ; যে পাপড়িটা সে নিজের গায়ে জড়িয়ে এসেছিল সেটাও খুলে ঢাকল তার মাথা।

তার পরের রাত্রেও আঙুলিনা চুপে-চুপে পাখিটার কাছে এল ; এখন সে দস্তুরমতো বেঁচে উঠেছে, কিন্তু ভারি দুর্বল, একবার মোটে চোখ খুলে সে তার দিকে তাকাল। আঙুলিনা হাতে এক টুকরো পচা কাঠ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—লণ্ঠন সে কোথায় পাবে?

'ছোট্ট মেয়ে, তুমি ভারি লক্ষ্মী', সোয়ালো খুব সরু গলায় বললে। 'এখন আমি গরম হয়েছি রাজার মতো। শিগগিরই আমি আবার গায়ে জোর পাব, উড়ে বেড়াতে পারব গরম রোদ্দুরে।'

আঙুলিনা বললে, 'বাইরে কী ঠাণ্ডা, উঃ! কেবল বরফ আর বরফ! থাক তুমি তোমার গরম বিছানায় শুয়ে—আমি তোমাকে দেখব।'

তারপর সে ফুলের পাপড়িতে করে জল এনে দিলে ; জল খেয়ে সোয়ালো বললে যে, দলের সঙ্গে উড়ে যেতে-যেতে একটা কাঁটাঝোপে পড়ে তার পাখা গিয়েছিল ভেঙে, তারপর আর অন্যদের সঙ্গে-সঙ্গে চলতে পারলে না, তারা গেল তাকে পিছনে ফেলে অনেক, অনেক দূরে, গেল গরমের দেশে চলে—এদিকে সে মাথা ঘুরে পড়ল মাটিতে, তারপর আর-কিছু তার মনে নেই। কেমন করে সুড়ঙ্গের মধ্যে এল সে জানে না।

সমস্তটা শীত সোয়ালো রইল সেখানে, আঙুলিনা প্রাণ দিয়ে তার সেবা-যত্ন করলে। এ-ব্যাপারটা না জানল ইঁদুর, না জানল ছুঁচো—তারা তো পাখিটাকে দেখতেই পারে না। যেই এল বসন্ত, সূর্য গরম হয়ে উঠল, অমনি সোয়ালো আঙুলিনার কাছে বিদায় চাইল, আর আঙুলিনা খুলে দিল ছাদের সেই ফুটোটা, চমৎকার রোদ এসে পড়ল তাদের গায়ে।

সোয়ালো বললে, 'ছোট্ট মেয়ে, তুমি কি আসবে আমার সঙ্গে? তুমি তো বেশি ভারি নও, আমি তোমাকে পিঠে করে নিয়ে যেতে পারব। যাবে আমার সঙ্গে সবুজ বনের মধ্যে উড়ে?'

কিন্তু সে চলে গেলে তো বুড়ো ইঁদুরটার ভারি কষ্ট হবে, তাই ভেবে আঙুলিনা বললে : 'না, যেতে আমি পারি নে।'

'ছোট্ট লক্ষ্মী মেয়ে, তোমাকে ভুলব না', বলে পাখি উড়ে চলে গেল বাইরে রোদ্দুরে। আঙুলিনা তার দিকে তাকিয়ে রইল, জলে ভরে উঠল তার চোখ। এ-ক'দিনে সোয়ালোর সঙ্গে তার সত্যি খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল।

'কিচ্-কিচ্! কিচ্-কিচ্-কিচ্!' গান করতে-করতে উড়ে গেল পাখি বনের মধ্যে! আঙুলিনার মন বড়ো খারাপ হয়ে গেল। বাইরে ঐ সুন্দর ঝকঝকে রোদ্দুরে যেতে মানা। ইঁদুরের বাড়ির উপর যে-ধান লাগানো হয়েছিল তা আজ উঁচু হয়ে উঠে হাওয়ায় দুলছে—তার পক্ষে সেটা অবিশ্যি ঘন বনের মতো, মোটে এক ইঞ্চি লম্বা সে।

একদিন বুড়ো ইঁদুর বললে, 'শোনো খবর! আমার বন্ধু তো তোমায় বিয়ে করতে চান। কত জন্ম তপস্যাই তুমি করেছিলে যেন! এখন আর কথা নেই, কাজে লেগে যাও। তৈরী করে ফ্যাল তোমার সব কাপড়চোপড়, সুতি জামা, পশমি জামা—ছুঁচোর বৌ হয়ে এটা নেই, ওটা নেই বললে চলবে কেন?'

আঙুলিনা কী আর করে, তকলি নিয়ে সুতো কাটতে বসল ; এদিকে ইঁদুর চার-চারটে মাকড়শাকে কাজে লাগিয়ে দিলে—দিন নেই, রাত নেই, তারা বুনে চলেছে। ছুঁচো রোজ সন্ধেবেলা একবার দেখা করে যায়। 'ইশ—কী গরম আজকাল!' তার মুখে কেবলি এই কথা। এত গরম যে পৃথিবী নাকি পুড়ে ঝামার মতো শক্ত হয়ে যাবে। গ্রীষ্ম ফুরিয়ে এলেই সূর্যের তাপ কমবে—হ্যাঁ, গ্রীষ্ম শেষ হলেই সে আঙুলিনার সঙ্গে তার বিয়ের দিন ঠিক করে ফেলবে। কথাটা শুনে আঙুলিনা অবিশ্যি একেবারেই খুশি হতে পারল না, ছুঁচোটাকে সে মোটেই দেখতে পারে না। রোজ সকালে যখন সূর্য ওঠে, আর রোজ সন্ধ্যায় যখন সূর্য অস্ত যায়, সে একবার বাইরের দরজার ধারে গিয়ে দাঁড়ায় ; আর যখন হাওয়া দেয়, ধানের শিষগুলো দু-ফাঁক হয়ে যায়, নীল আকাশ তার চোখে পড়ে—মনে মনে সে ভাবে, বাইরে কী সুন্দর রোদ উঠেছে না জানি, সোয়ালোকে তার মনে পড়ে যায়। যদি তাকে আবার দেখতে পেত! কিন্তু সোয়ালো আর ফিরে আসে না—সে নিশ্চয়ই উড়ে চলে গেছে অনেক দূরে, ঘন সবুজ বনের মধ্যে। গ্রীষ্ম ফুরিয়ে আবার যখন আকাশে শীতের ভাব, তখন আঙুলিনার সব জামা-কাপড় তৈরী শেষ হল।

বুড়ো ইঁদুর বললে, 'আর এক মাসের মধ্যেই তোমার বিয়ের দিন ঠিক।'

শুনে আঙুলিনা কেঁদে বললে, ঐ ছিঁচকে ছুঁচোটাকে কিছুতেই বিয়ে করবে না সে।

'এ কী কথা বাছা!' ইঁদুর বলে উঠল। 'নাও, আর গোঁয়ার্তুমি কর না, তাহলে দেব কিন্তু কামড়ে—দেখছ দাঁত!' বলে ইঁদুর মুখ ভেংচিয়ে তার ধারাল শাদা দাঁতের পাটি দেখাল। 'কেমন লোকের সঙ্গে তোমার বিয়ে হচ্ছে সে-খেয়াল আছে? কে ওঁর মতো বড়ো? দেশের রানীরও কি আছে এমন চমৎকার কাল মখমলের কোট? আর তাঁর ভাঁড়ার বারোমাস ভর্তি! তোমার কপাল দেখে চারদিকের লোক হিংসেয় পুড়ছে, আর তুমি কিনা—হুঁ!'

বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেল। ছুঁচোর বাড়িতেই বিয়ে হবে, ছুঁচো তাকে নিতে এসেছে। এর পর থেকে তাকে থাকতে হবে মাটির নিচে গর্তে, কখনো উপরে আসবে না ঝকঝকে রোদ্দুরে, ছুঁচোর তা একেবারেই পছন্দ নয়। ছোট্ট আঙুলিনার বেজায় মন খারাপ হয়ে গেল ; তবু তো এ-কদিন আর বুড়ো ইঁদুরের দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে মাঝে-মাঝে সে সূর্যকে দেখতে পেয়েছে, কিন্তু এখন এই আশ্চর্য সুন্দর সূর্যের কাছ থেকে চিরদিনের মতো তাকে বিদায় নিতে হবে।

'সূর্য, আমাকে ক্ষমা করো', বলতে-বলেতে আঙুলিনা সূর্যের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে ইঁদুরের ঘর থেকে বেরিয়ে খানিক দূর হেঁটে গেল,—এখন তো ধান কাটা হয়ে গেছে, খেতভরা আবার শুকনো খড়। এখনো ফুটে রয়েছে এক কোণে ছোট্ট একটি লাল ফুল, তাকে জড়িয়ে ধরে আঙুলিনা আবার বললে, 'লাল ফুল, আমাকে ক্ষমা করো। যদি কখনো সেই পাখির দেখা পাও, আমার কথা বল তাকে।'

'কিচ্-কিচ্! টু-টিট্রি! কিচ্-কিচ্!' ঠিক তার মাথার উপর কে বলে উঠল। উপরে তাকিয়ে সে দেখল, সেই ছোট্ট সোয়ালো উড়ে চলে যাচ্ছে। সে খুব খুশি হল আঙুলিনাকে দেখে ; আঙুলিনা বললে, 'শিগগিরই তাকে বিদঘুটে ছুঁচোটাকে বিয়ে করতে হবে, থাকতে হবে মাটির তলায়, সেখানে রোদের মুখ কখনো দেখতে সে পাবে না।' বলতে বলতে সে একটু না-কেঁদে পারলে না।

সোয়ালো বললে, 'শীত তো এল বলে—আমি উড়ে যাচ্ছি গরমের দেশে, তুমি কি আসবে আমার সঙ্গে? তুমি বসবে আমার পিঠে চড়ে—দু'জনে উড়ে পালিয়ে যাব ঐ কিম্ভূত ছুঁচোটার হাত থেকে, পালাব তার ঘুটঘুটি ঘর থেকে—যাব দূরে, আরো দূরে ; পাহাড় পার হয়ে গরমের দেশে, সূর্য যেখানে এখানকার চেয়ে গরম, যেখানে সারা বছর গ্রীষ্ম, আর কত সুন্দর ফুল ফুটে রয়েছে! এসো ছোট্ট মিষ্টি মেয়ে, এসো আমার সঙ্গে—সেই কাল স্যাঁৎসেঁতে সুড়ঙ্গে যখন মরে পড়েছিলুম, তুমিই তো আমাকে বাঁচিয়েছিলে।'

'হ্যাঁ, যাব, যাব তোমার সঙ্গে', আঙুলিনা বলে উঠল। সে চড়ে বসল পাখির পিঠে, পা রাখল তার মেলে-দেয়া ডানায়, মজবুত একটা পালকের সঙ্গে নিজেকে শক্ত করে বাঁধল। তারপর পাখি আকাশে উড়ে চলল বনের উপর দিয়ে, সমুদ্রের উপর দিয়ে, আরো-উঁচুতে বিশাল পাহাড়ের উপর দিয়ে, যেখানে বারোমাস বরফ, আর আঙুলিনার মুখে লাগল ধারাল ঠাণ্ডা হাওয়া, সে রইল গরম পালকের মধ্যে ডুবে,—শুধু মাঝে-মাঝে মুখ তুলল নিচে পাহাড়ের আশ্চর্য রূপ দেখতে।

অবশেষে তারা এল গরমের দেশে। সেখানে সূর্য অনেক বেশি উজ্জ্বল, আকাশ মনে হয় যেন দ্বিগুণ উঁচুতে; আর অলিতে-গলিতে ঝোপে-ঝাড়ে ফলে রয়েছে অপরূপ নীল সবুজ রাশি-রাশি আঙুর; বাগানে ঝুলছে বাতাবিলেবু আর কমলালেবু; বাতাসে চন্দনের আর হাসনু হানার গন্ধ আর পথে পথে কী সুন্দর সব ছেলেমেয়ে ছুটোছুটি করছে, খেলা করছে চিকচিকে ফুর্তিবাজ প্রজাপতিদের সঙ্গে। কিন্তু পাখি উড়ে গেল আরো দূরে, সে-দেশ আরো বেশি সুন্দর। নীল হ্রদের ধারে, আরো অপরূপ সবুজ গাছের ছায়ায় ঝকঝকে শ্বেত পাথরের প্রাসাদ, কত দিনের কেউ জানে না, উঁচু থাম বেয়ে উঠেছে আঙুরের লতা, তার মাথায় অনেক সোয়ালো পাখির বাসা—আর তারই এক বাসায় থাকে এই সোয়ালো, আঙুলিনাকে যে নিয়ে এসেছে।

সোয়ালো বললে, 'এই তো দেখছ আমার বাড়ি। বিশ্রী অগোছাল হয়ে পড়ে আছে, তুমি তো এখানে থাকতে পারবে না! নিচে যে-সব ফুল দেখছ তার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর একটা বাছ তো! সেখানে রাখব তোমাকে—একেবারে মনের মতো ফিটফাট।'

'বাঃ, বেশ তো', বলে আঙুলিনা তার ছোটো হাতে তালি দিয়ে উঠল।

শ্বেত পাথরের প্রকাণ্ড একটা থাম মাটিতে পড়ে তিন টুকরো হয়ে ভেঙে গেছে, তারই ফাঁকে-ফাঁকে ফুটেছে সবচেয়ে সুন্দর মস্ত-মস্ত শাদা ফুল! সোয়ালো আঙুলিনাকে নিয়ে নেমে এসে তাকে বসিয়ে দিলে ওরই একটা চওড়া পাপড়িতে। কিন্তু—এ কী! ছোটো মেয়েটি কী যে চমকে উঠল ভাবতেও পারবে না। ফুলের মধ্যে বসে আছে ছোট্ট একটি মানুষ, এত শাদা আর স্বচ্ছ যেন কাচের তৈরী, মাথায় তার পরিষ্কার কাজ-করা সোনার মুকুট, কাঁধে ঝলসাচ্ছে উজ্জ্বল পাখা—আর সব জড়িয়ে আঙুলিনার চাইতে কিছু বড়ো নয়। সে সেই ফুলের পরী! প্রত্যেক ফুলের মধ্যেই এমন একজন করে থাকে, কিন্তু এ হচ্ছে তাদের সকলের উপরে রাজা।

'কী সুন্দর দেখেছ!' আঙুলিনা পাখির কানে-কানে বললে।

এদিকে ছোট্ট রাজপুত্র সোয়ালোকে দেখে বিষম ভয় পেয়ে গেছে; তার কাছে ও-তো বিশাল একটা পাখি, সে এত ছোটো। কিন্তু আঙুলিনাকে যখন দেখল, খুব খুশি হল সে, এত সুন্দর মেয়ে সে কখনো দেখে নি। তাই সে খুলে ফেলল তার মাথার মুকুট, পরিয়ে দিলে আঙুলিনার মাথায়, জিজ্ঞেস করলে, 'কী নাম তোমার? তুমি কি হবে আমার রানী, এই সমস্ত পরীদের রানী?'

এখন সেই ব্যাঙ্গমীর চ্যাপটা ছেলেটা, কি কাল মখমলের কোটওয়ালা ছুঁচোর চাইতে এই পরম সুন্দর রাজপুত্র অবিশ্যি আলাদা রকমের মানুষ। আঙুলিনা তাই একটু ভেবে বললে, 'হ্যাঁ।' আর সঙ্গে-সঙ্গে প্রত্যেক ফুল থেকে বেরিয়ে এল একটি করে পরী, প্রত্যেকে এত সুন্দর যে দেখেও সুখ; আর প্রত্যেকে আঙুলিনার জন্যে একটি করে উপহার আনল—আর উপহারের মধ্যে সবচেয়ে ভালো হচ্ছে সুন্দর একজোড়া শাদা পাখা। পাখাজোড়া আঙুলিনা দেখেই চিনল—এ সেই শাদা প্রজাপতির, যে তার সঙ্গে সঙ্গে নদীতে এসেছিল, মরবার সময় সে পাখাজোড়া তাকে দিয়ে গেছে। সেই পাখা এখন তার কাঁধে লাগানো হল, সে এখন ফুলে-ফুলে উড়ে-উড়ে বেড়াতে পারবে। তারপর শুরু হল উৎসব; কথা হল সোয়ালো উঁচুতে তার বাসায় বসে বিয়ের গান গাইবে। গান গাইল সোয়ালো! কিন্তু ভিতরে-ভিতরে তার মনটা বেশি ভালো নেই—আঙুলিনাকে সে খুব ভালবাসত। আর আজ কিনা তার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি!

ফুলের পরী বললে, 'তুমি এত সুন্দর, আর তোমার নামটা কী বিশ্রী! আজ থেকে তোমার নাম আর আঙুলিনা নয়, তোমার নাম হল মায়া।'

ঠান্ডা দেশের পন্ডিত

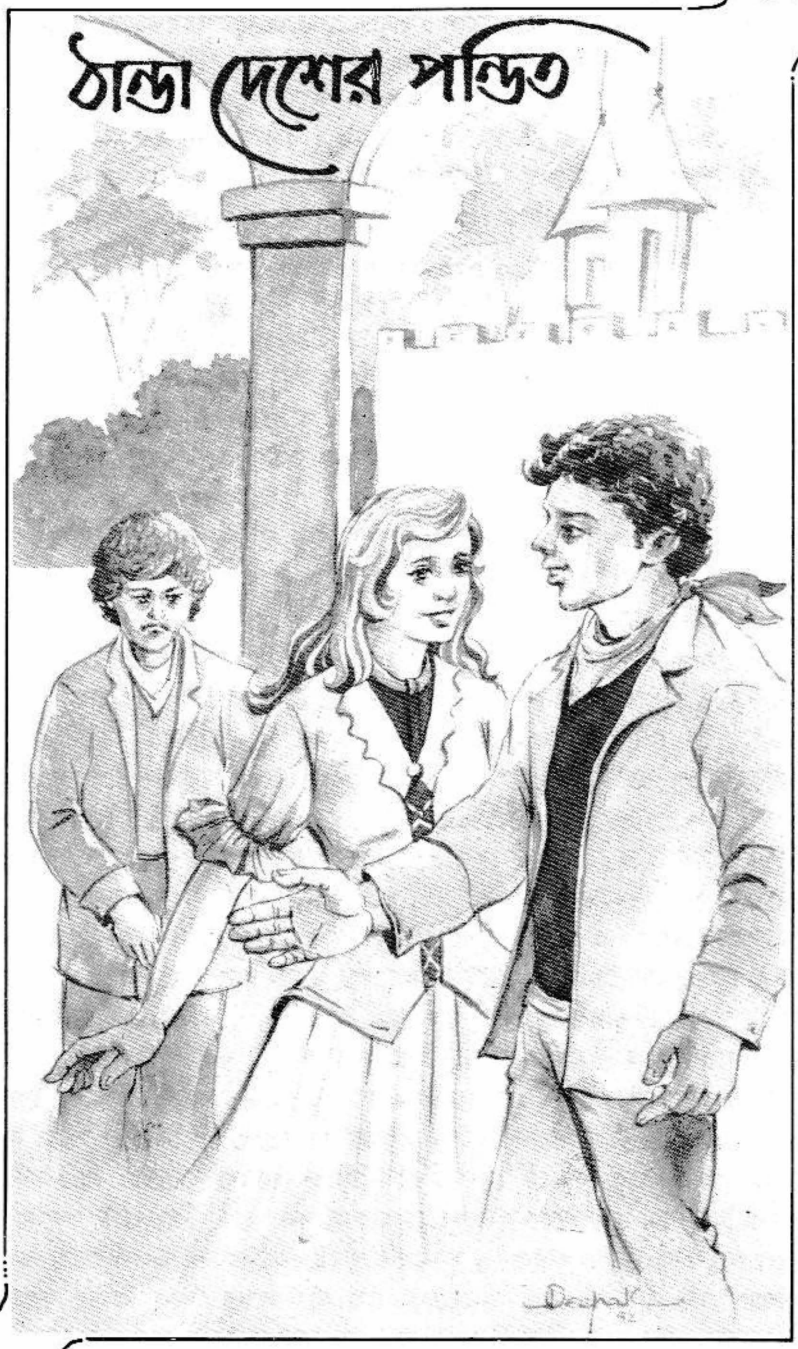

গরমের দেশে সূর্যের বড়ো তাপ ; মানুষগুলোর রং হয়ে যায় মেহগিনির মতো ব্রাউন, আর সবচেয়ে-গরম দেশগুলোয় তো পুড়ে-পুড়ে কাল কাফ্রি হয়ে যায়। তবে এবার অবিশ্যি ঠাণ্ডা দেশের পণ্ডিত গরম দেশেই গিয়ে পড়েছিলেন, সবচেয়ে গরম দেশে যান নি। ভেবেছিলেন, দেশের মতোই বুঝি ঘুরে-ঘুরে এখানে-ওখানে বেড়াতে পারবেন, কিন্তু শিগগিরই তাঁকে মতো বদলাতে হল। অন্য সব বুদ্ধিমান লোকের মতো তাঁকেও থাকতে হল বাড়িতে বসে, সমস্ত দিন দরজা-জানালা বন্ধ করে, ভাবখানা এমন, যেন বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে আছে কি বেরিয়ে গেছে। যে-রাস্তায় তিনি থাকতেন সেটি সরু, আর দু'দিকে উঁচু-উঁচু বাড়িগুলো এমনভাবে তৈরী যে সকাল থেকে সন্ধে অবধি রোদে পুড়ে যায়—অসহ্য লাগে, সত্যি। ঠাণ্ডা দেশের পণ্ডিতের বয়েস অল্প, খুব বুদ্ধিমান, ক্রমে তাঁর মনে হতে লাগল যে তিনি একটা জ্বলন্ত উনুনের মধ্যে বসে আছেন; আর বসে-বসে বড়ো অবসন্ন লাগল তাঁর, দস্তুরমতো শুকিয়ে গেলেন তিনি। এমনকি তাঁর ছায়াও কুঁকড়ে আগেকার চাইতে ছোটো হয়ে গেল ; শুধু তাই নয়, সূর্য ছায়া বেচারাকে বেমালুম কেড়েই নিয়ে যেত, সন্ধের সময় সূর্যাস্ত না হলে আর ফিরিয়ে দিত না। ভারি ভালো লাগত এটা দেখতে। সন্ধের সময় যেই আলো জ্বলল, অমনি ছায়া আড়মোড়া ভেঙে লাফিয়ে উঠল দেয়ালে, হঠাৎ মস্ত লম্বা হয়ে ছাদে মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়াল! সত্যিই তো, একটু হাত-পা না-ছুঁড়লে বেচারার গায়ের জোর ফিরে আসবে কেন? পণ্ডিতও বারান্দায় গিয়ে একটু হাত-পা ছড়ান ; সুন্দর নীল আকাশে তারারা বেরিয়ে আসে, তা-ই দেখে তিনি জীইয়ে ওঠেন। রাস্তার ধারের সব বারান্দায়—জানো তো, গরমের দেশে সব বাড়িরই বারান্দা আছে—ছেলে-ছোকরারা একে-একে বেরিয়ে আসে, কেননা খানিকটা টাটকা হাওয়া না হলে প্রাণ বাঁচে না, গায়ের মেহগনি-রংটা না-হয় সয়েই গেছে। তখন উপরে নিচে সবখানে নানারকম সাড়াশব্দ : রাস্তায় বসে জটলা করে দরজি আর ছুতোর, মুচি আর ধাঙড়—অর্থাৎ কিনা নানারকমের, সবরকমের লোক ; তখন বাইরে পড়ে টেবিল আর চেয়ার, জ্বলে মোমবাতি, কম-সে-কম হাজারটা মোমবাতি ; কেউ কথা কয়, কেউ গান গায়; লোকেরা হেঁটে বেড়ায় পথে-ঘাটে ; মস্ত জুড়িগাড়ি চলে যায় খটাখট শব্দে, ওদিকে খচ্চরের গলায় ঘণ্টা বাজে টুংটাং ; কারা মৃতদেহ নিয়ে যায় গম্ভীর গলায় গান-গেয়ে, বাজে মন্দিরের ঘণ্টা ; সব জড়িয়ে একখানা কাণ্ড বটে। শুধু একটা বাড়ি—আমাদের ঠাণ্ডা দেশের পণ্ডিতের ঠিক সামনের বাড়িটা একেবারে চুপচাপ, কোনো শব্দ আসে না সেখান থেকে, তবু নিশ্চয়ই সেখানে কেউ থাকে—কেননা বারান্দায় সারি-সারি ফুলের টব, গরম রোদ পেয়ে ফুল ফুটেছে আশ্চর্য সুন্দর হয়ে, কিন্তু কেউ জল না-দিলে তো তারা ফুটতে পারত না, সুতরাং নিশ্চয়ই কেউ তাদের জল দিয়েছে আর সুতরাং সেই বাড়িতে কেউ না-থেকেই যায় না। সন্ধের দিকে বাড়ির দরজা আদ্ধেকটা খোলে বটে—কিন্তু ভিতরটা অন্ধকার, সামনের ঘরটা অন্তত অন্ধকার ;

আর বাড়ির ভিতরের দিক থেকে শোনা যায় গান-বাজনার শব্দ। বিদেশি পণ্ডিতের বড়ো মধুর লাগল সেই গান ; কিন্তু সত্যি সে-গান মধুর, না তাঁর মনের কল্পনা, তা অবিশ্যি বলা যায় না ; কেননা সেই গরমের দেশের সবই তাঁর ভালো লাগত—ভালো লাগত, যদি না সূর্যটা অমন বাড়াবাড়ি করত। বাড়িওলা বললে, উল্টো দিকের বাড়িটায় কে থাকে সে জানে না, কাউকে তো দেখা যায় না ওখানে—আর গান, আরে রামো! ঐ একঘেয়ে প্যানপ্যানানি আবার গান নাকি?

'ঠিক যেন', বাড়িওলা বুঝিয়ে বললে, 'যেন কেউ সারাক্ষণ বসে বসে একটা গান শিখছে—একটাই গান, কিছুতেই শিখতে পারছে না। সে যেন জেদ করে বলছে, "শেষ পর্যন্ত আমি পারবই ;" কিন্তু যতক্ষণ ধরে যত চেষ্টাই করছে, কিছুতেই পারছে না।'

বিদেশি পণ্ডিত রাত্রে কিন্তু থেকে-থেকে জেগে উঠলেন, তিনি ঘুমিয়েছিলেন বারান্দার দরজা খুলে, হঠাৎ হাওয়ায় পরদাটা সরে গেল, আর তাঁর মনে হল উল্টো দিকের বাড়ি বারান্দা থেকে আশ্চর্য একটা আভা আসছে ; ফুলগুলো সব নানা রঙের ঝলোমলো আগুনের মতো জ্বলে উঠল, আর তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পাৎলা ছিপছিপে এক অপরূপ কন্যা—মনে হয় যেন তাঁরও ভিতর থেকে আভা ফুটে বেরুচ্ছে। পণ্ডিতের চোখ গেল ঝলসে ; কিন্তু যেই তিনি ভালো করে চোখ মেলে তাকাতে যাবেন অমনি চমকে জেগে উঠলেন ঘুম থেকে। এক লাফে নামলেন বিছানা থেকে, চুপে-চুপে, খুব চুপে-চুপে পরদার পিছনে গিয়ে দাঁড়ালেন—কিন্তু কোথায় সেই কন্যা! সেই আভাই-বা কোথায়—ফুলগুলো তো আর জ্বলে না, আগেরই মতো ঠাণ্ডা সুন্দর হয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। দরজাটা আদ্ধেক খোলা, আর ভিতর থেকে আসছে গান-বাজনার শব্দ—এমন সুন্দর, এমন আশ্চর্য সুন্দর যে শুনলেই মধুর ভাবনায়-ভাবনায় মন ভরে যায়। গান তো নয়, যেন জাদু!

কিন্তু কে থাকে ওখানে, কে? কোনখান দিয়ে ঠিক ডাকবার দরজা? সামনের রাস্তায় আর পাশের গলিতে সমস্ত একতলাটা ভরে তো দোকানের পর দোকান—সেখান দিয়ে তো আর যাওয়া-আসা চলে না।

একদিন বিদেশি বসে আছেন তাঁর বারান্দায়, আর ঠিক পিছনের ঘরটিতে জ্বলছে আলো ; কাজে-কাজেই তাঁর ছায়া গিয়ে পড়েছে বরাবর সামনের বাড়ির একেবারে দেয়ালের গায়ে ; আরে—ঠিক তো ফুলগুলোর মাঝখানে গিয়ে বসেছে, আর তিনি যখনই একটু নড়ছেন, সে-ও নড়ছে সঙ্গে সঙ্গে।

'যতদূর দেখা যাচ্ছে, ওখানে আমার ছায়াই একমাত্র জীবন্ত প্রাণী', পণ্ডিত মনে-মনে বললেন। 'কী সুন্দর সে বসে আছে ফুলগুলোর মধ্যে দেখো না! দরজাটা তো আদ্ধেক খোলাই আছে, যাও না বাপু একটু বুদ্ধি করে ভিতরে ঢুকে, দেখে এসো না ব্যাপারখানা কী, এসে বল আমাকে।' তারপর, ঈষৎ ঠাট্টার সুরে আরো বলতে লাগলেন, 'ইচ্ছে করলেই তো আমার এ-উপকারটা করতে পারো। দয়া করে ঢুকেই

পড় না—যাবে নাকি, বল।' ছায়ার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন তিনি, ছায়াও ফিরে মাথা নাড়ল। 'নাও—যাও এখন, কিন্তু একেবারে থেকে যেও না আবার!'

বিদেশি উঠে দাঁড়ালেন, মুখোমুখি বারান্দায় তাঁর ছায়াও উঠে দাঁড়াল। তারপর তিনি সরে এলেন—আরো ভালো করে লক্ষ করলে কেউ দেখতে পেত, ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁর ছায়া গেল চলে, সোজা আধো-খোলা দরজা দিয়ে একেবারে ভিতরে, এদিকে বিদেশি তাঁর ঘরে ফিরে এসে পরদা নামিয়ে দিলেন।

পরের দিন সকালে তিনি গেলেন বাইরে কফি খেতে আর কাগজ পড়তে।

'এ কী!' রোদ্দুরে বেরিয়েই তিনি চমকে উঠলেন। 'আমার ছায়া কী হল? ও তাহলে সত্যি-সত্যি কাল সন্ধ্যাবেলায় চলে গিয়েছিল—আর ফিরেও এল না! ভারি মুশকিল তো!'

মনে মনে তিনি বিরক্ত হলেন, কিন্তু ছায়া চলে গেছে বলে খুব বেশি নয়। বিরক্ত হবার আসল কারণটা এই যে তিনি জানতেন একজন মানুষ সম্বন্ধে একটা গল্প আছে যার নাকি ছায়া ছিল না। যে-বাড়িতে তিনি থাকেন সেখানে সবাই জানে গল্পটা ; পণ্ডিত যদি এখন গিয়ে গল্পটা বলেন সবাই বলে উঠবে এটা নকল, আর তাঁর সম্বন্ধে কেউ এ-কথা বলে এটা তিনি মোটেই চান না। সেইজন্যে তিনি ভাবলেন কারো কাছে কিছু বলে কাজ নেই—ভালোই ভাবলেন।

সন্ধেবেলায় আবার তিনি বারান্দায় বেরিয়ে এলেন, রাখলেন আলোটা তাঁর পিছনে ; তিনি তো জানতেন প্রভুর আড়ালেই ছায়া ফুটে ওঠে, কিন্তু অনেক করেও ছায়াকে টেনে বার করতে পারলেন না। বসলেন তিনি ছোটো হয়ে, দাঁড়ালেন তিনি লম্বা হয়ে, কিন্তু একফোঁটা ছায়া পড়ল না, একবারও এল না ছায়া। কত ডাকলেন তিনি 'এসো, এসো', বলে, কোনো ফল হল না।

বিরক্ত লাগল খুবই, কিন্তু গরমের দেশে সবই কিনা তাড়াতাড়ি বাড়ে, দিন সাতেক যেতেই পণ্ডিত দেখলেন যে যখনই তিনি রোদে বেরোন, তাঁর দু'পায়ের তলায় নতুন একটি ছোট্ট ছায়া গজিয়ে ওঠে। দেখে ভারি খুশি হলেন : ভাবলেন, গোড়াটা নিশ্চয়ই রয়ে গিয়েছিল। আরো কিছুদিন যেতে নতুন ছায়ার দস্তুরমতো বড়ো সড়ো ভদ্র চেহারা হল। তারপর তিনি যতদিনে উত্তরে তাঁর দেশে ফিরছেন ততদিনে নতুন ছায়া বাড়তে-বাড়তে এমন মস্ত লম্বা হয়ে গেল যে তিনি স্বচ্ছন্দে অন্য কাউকে আদ্ধেকটা দিয়ে দিতে পারতেন।

দেশে ফিরে পণ্ডিত বড়ো-বড়ো সব বই লিখলেন : পৃথিবীতে কাকে বলে সত্য, আর কাকে বলে ভালো, আর সুন্দরই-বা কী, এই সমস্ত তার বিষয়। তারপর দিন কেটে গেল, বছর কেটে গেল, অনেকগুলো বছর।

একদিন সন্ধের সময় তিনি তাঁর ঘরে বসে আছেন, দরজায় আস্তে কে টোকা দিলে। তিনি বললেন, 'এসো' ; কিন্তু কেউ এল না। তারপর তিনি উঠে গিয়ে দরজা খুললেন। যে-লোকটি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে সে এমন আশ্চর্য রকম রোগা যে তিনি

দস্তুরমতো অস্বস্তি বোধ করলেন। লোকটির কাপড়চোপড় কিন্তু খুবই ভদ্র রকমের, দেখে মনে হয় মানী লোক।

'কার সঙ্গে পরিচয়ের আমার সৌভাগ্য হল?' পণ্ডিত খুব বিনয় করে বললেন।

বড়োমানুষ চেহারার লোকটি বললে, 'ঠিক ভেবেছিলুম তুমি আমাকে চিনতে পারবে না। কী করেই বা পারবে—আমার এখন আস্ত একটা শরীর হয়েছে, দস্তুরমতো মাংস, তার উপর কাপড়চোপড় তো দেখছই। তুমি তো কখনো ভাব নি আমাকে এমন চেহারায় দেখবে। তোমার পুরোনো ছায়াকে চিনতে পারছ কি? নিশ্চয়ই ভাব নি আমি আবার ফিরে আসব! তোমাকে ছেড়ে এসেছি পর আমার দিন বেশ ভালো কেটেছে, খুবই ভালো বলতে হবে। সব রকমেই আমি এখন বড়োমানুষ। ইচ্ছে করলেই এখন আমার স্বাধীনতা কিনে নিতে পারি।'

বলে সে তার ঘড়ির চেনে বাঁধা কতগুলো দামি মাদুলি ঝনঝন করে বাজাল, তারপর গলার সঙ্গে জড়ানো মোটা সোনার চেনটা আঙুল দিয়ে নাড়াচাড়া করল, ঝকঝক করে উঠল অনেকগুলো হীরের আংটি তার আঙুলে। সব একেবারে সাঁচ্চা!

'তাই তো, আমার কি মাথা-খারাপ হয়ে গেল?' পণ্ডিত বলে উঠলেন। 'কী এর মানে কিছুই তো বুঝতে পারছি নে!'

'মানেটা মোটেও খেল নয়', ছায়া জবাব দিলে। 'তা তুমিও তো নেহাৎ খেল লোক নও; ছেলেবেলা থেকে তোমারই পায়ে পা ফেলে-ফেলে আমি বড়ো হয়েছি তা তুমি ভালো করেই জানো। যখনই দেখলাম পৃথিবীতে একা চরে-চরে বেড়াবার মতো বিদ্যে-বুদ্ধি আমার হয়েছে, তখনই বেরিয়ে পড়লাম। আমার এখন ঝমঝমে অবস্থা। কিন্তু তুমি মরে যাবার আগে তোমাকে আর-একবার দেখবার বড্ড ইচ্ছে হল, বড়ো ইচ্ছে হল এ-সব জায়গা আর একবার দেখে যাই—নিজের দেশের মায়া কাটানো শক্ত, জানোই তো। জানি তোমার এখন আর-একটি ছায়া আছে, আমাকে যে কিছু দিতে হবে, তা তাকে দেব, না তোমাকে? বললেই দিয়ে দিই এখুনি।'

'সত্যি তুমিই তাহলে?' পণ্ডিত বলে উঠলেন। 'কী আশ্চর্য! আমার পুরোনো ছায়াকে এমনি মানুষের চেহারায় আবার দেখব কে ভাবতে পেরেছিল?'

'কত দিতে হবে সেটা আগে বল। কারো ধারে থাকতে আমি পছন্দ করি নে।'

'ও-রকম কথা বল কেমন করে? ধারের কোনো কথা তো ওঠেই না। তুমি স্বাধীন—যে-কোনো লোকের মতোই স্বাধীন। খুব খুশি হয়েছি আমি তোমার সৌভাগ্যে! বোসো দেখি, সব খবর শুনি। কী করে হল এত সব, কী-কী দেখলে ঐ গরমের দেশে, কী দেখলে ঐ উল্টোদিকের বাড়িতে?'

'সে-কথাই তোমাকে বলব', বলে ছায়া বসল। 'কিন্তু একটা কথা। এ-শহরে কারো কাছে তুমি বলতে পারবে না যে আমি তোমার ছায়া ছিলাম। শিগগিরই বিয়ে করব ভাবছি—স্ত্রী-পুত্র প্রতিপালনের ক্ষমতা এখন আমার যথেষ্টই হয়েছে।'

'ভয় নেই, ভয় নেই', পণ্ডিত বললেন। 'সত্যি-সত্যি তুমি কে তা কাউকে বলব না। এই তোমাকে ছুঁয়ে বলছি।'

কিন্তু ছায়াকে সত্যি-সত্যি তো আর ছোঁবার কিছু নেই, তাই সে উত্তরে বললে, 'ছায়ার কথাই লাখ টাকা।' কিন্তু সত্যি-সত্যি কতখানি আস্ত মানুষ সে হয়ে উঠেছিল সে ভারি আশ্চর্য। কুচকুচে কাল তার পোশাক, চমৎকার কাল কাপড়ে তৈরী, ঝকঝকে জুতো আর টুপি, আর তা ছাড়া আগেই তো দেখেছি তার দামি মাদুলির বহর, তার সোনার চেন, হীরের আংটিগুলো। সত্যি তার কাপড়চোপড় আশ্চর্য-রকম ভালো : আর তারই জোরে সে প্রায় আস্ত মানুষ হয়ে উঠেছে।

'এখন শোনো তাহলে', সে বললে। এদিকে পণ্ডিতের নতুন ছায়া ছোট্ট কুকুরের মতো তাঁর পায়ে পড়ে আছে, মানুষ-ছায়া তার হাতের উপর ঝকঝকে জুতো দিয়ে যত জোরে পারে দিলে চাপ। এটা সে করলে বোধহয় গর্বের ভাব থেকে : কি হয়-তো নতুন ছায়া যাতে তার পায়েই পড়ে থাকে, সেইজন্যে ; কিন্তু গুটিগুটি ছোটো ছায়াটি হাত-পা মুড়ে চুপ করে রইল—তার ইচ্ছে কান পেতে সব কথা শুনবে, তাহলে সে ও জানতে পারবে কী করে একেবারে স্বাধীন হয়ে মস্ত বড়োমানুষ হওয়া যায়।

ছায়া বলতে লাগল, 'আমাদের ঐ বাড়িটায় বরাবর কে থাকত, জানো? আরে সেটাই তো সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা—সেখানে কবিতারানী থাকতেন যে! তিন সপ্তাহ সেখানে ছিলুম আমি—কিন্তু মনে হয় যেন হাজার বছর কাটিয়ে এসেছি, যত-কিছু লেখা হয়েছে গদ্যে-পদ্যে সব পড়ে ফেলেছি। সত্যি, সত্যি বলছি তোমাকে—সব আমি দেখেছি, সব জানি।'

'কবিতা!' পণ্ডিত চেঁচিয়ে বলে উঠলেন। 'কবিতা-রানী। হ্যাঁ ঠিকই—প্রায়ই তিনি আড়ালে লুকিয়ে থাকেন বড়ো-বড়ো শহরে। কবিতা! আমিও তাঁকে দেখেছিলাম এক মুহূর্তের ঝলকে, কিন্তু চোখ ছিল আমার ঘুমে ভরা ; তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন বারান্দায়, আগুনের মতো জ্বলছিলেন, মেরুর অরোরা যেমন করে জ্বলে, যেমন করে ফুটে ওঠে জীবন্ত লাল-নীল আগুনে। বল, বল! তুমি তো ছিলে সেই বারান্দায়! তুমি ঢুকে গেলে দরজা দিয়ে, আর তারপর—'

'তারপর আমি গেলুম পাশের একটা ছোটো ঘরে। তুমি মুখোমুখি বসে সব সময় তাকিয়ে থাকতে সেই ঘরটার দিকে। সে-ঘরে আলো নেই, কেমন একটা আধো ছায়ার ঘোর। কিন্তু তারপর দরজার পর দরজায় কত ঘর, কত মণ্ডপ কত-কিছু ; আর কী আলো! রানী যেখানে বসেছিলেন অতদূর গেলে বোধ হয় চোখ ঝলসে মরেই যেতাম। কিন্তু আমি বুদ্ধি করে সইয়ে-সইয়ে সব করেছিলুম—তা-ই করা উচিত।'

'কী দেখলি? তারপর কী দেখলি?'

'সবই আমি দেখেছি, সবই বলব। কিন্তু—কিছু মনে করো না, সত্যি জাঁক করছি নে কোনোরকম—তবে আমি কিনা আজকাল স্বাধীন মানুষ, তা ছাড়া বিদ্যেবুদ্ধিও তো কম নয়—মান-সম্মান, ভালো অবস্থার কথা না-হয় ছেড়েই দিলাম—মোট কথা, আমাকে "তুমি" বললেই খুশি হব।'

'তাই তো, বড়ো ভুল হয়ে গেছে', পণ্ডিত তাড়াতাড়ি বললেন।

'এই "তুই" বলাটা আমার একটা পুরনো অভ্যেস, আর পুরোনো অভ্যেস ছাড়া সহজ নয়। ঠিক বলেছ তুমি, আর আমার ভুল হবে না। যাক, এখন বল দেখি সব। কী দেখলে সব বল।'

ছায়া জবাব দিলে, 'সবই বলছি। আমি যে-সব দেখে এসেছি, সব জানি আমি।'

পণ্ডিত জিজ্ঞেস করলেন, 'ভিতরের ঘরটা কেমন দেখতে? ঠাণ্ডা কুঞ্জবনের মতো কি? মন্দিরে ঢুকলে যেমন লাগে সেইরকম লাগে বুঝি ভিতরে গেলে? উঁচু পাহাড়ের চুড়ো থেকে তারাভরা আকাশ দেখতে যেমন, সেইরকমই দেখতে ঘরগুলো?'

ছায়া বললে, 'সব, সব আছে সেখানে। আমি অবিশ্যি একেবারে ঠিক ভিতরে যাই নি, আমি ছিলুম সামনের ঘরটায়, সেখানে আধো অন্ধকার, কিন্তু সেখানে আমি দাঁড়িয়ে ছিলুম যাকে বলে একেবারে গ্যাঁট হয়ে। সব আমি দেখে এসেছি, সব আমি জানি। কবিতা রানীর সভার পাশের ঘরটাতেই তো আমি ছিলুম।'

'কিন্তু কী দেখলে? কী দেখলে বল না! পুরাণের সব দেবতারা কি সেই প্রকাণ্ড মণ্ডপের ছায়ায় ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন? বীর নায়কদের যুদ্ধ হচ্ছিল সেখানে? ফুটফুটে ছোটো-ছোটো ছেলে-মেয়েরা বুঝি সেখানে খেলা করছিল, বলছিল স্বপ্নের কথা?'

'তোমাকে তো বলছি যে সেখানে আমি গিয়েছিলুম—বুঝতে পারো না, যা-কিছু সেখানে দেখবার সব আমি দেখেছি। তুমি যদি সেখানে যেতে তাহলে আর মানুষ থাকতে না ; কিন্তু আমি সেখানে গিয়ে মানুষ হয়ে উঠলুম—বুঝতে শিখলুম আমার ভিতরের লোকটাকে, কবিতা রানীর সঙ্গে কেমন আমার সম্পর্ক সে-ও জানলুম। শোনো, যখন তোমার সঙ্গে ছিলুম তখন এ-সব কথা একবার মনেও হয় নি ; কিন্তু তুমি তো জানো যে যখনই সূর্য ওঠে, কি সূর্য অস্ত যায় তখনই আমি ছিলুম আশ্চর্যরকম বড়ো, আর চাঁদের আলোয় তো প্রায় তোমার চেয়েও বেশি স্পষ্ট ছিলুম। তখন পর্যন্ত আমার ভিতরের লোকটাকে বুঝতে পারি নি ; সেই পাশের ছোটো ঘরে সে যেন বেরিয়ে এল আমার সামনে। আমি মানুষ! আমি মানুষ হয়ে উঠলুম! বেরিয়ে এলুম সাবালক হয়ে। কিন্তু ততদিনে তুমি ঐ গরম দেশ ছেড়ে চলে এসেছ। মানুষ হয়ে কি আর আগেকার মতো চেহারা করে থাকা যায়—লজ্জা করে না? চাই জুতো, চাই জামা-কাপড়, চাই সব মানুষ-মার্কা পালিশ যা দিয়ে মানুষ মানুষকে চেনে। লুকিয়ে রইলুম কিছুদিন—গোপনে বলছি তোমাকে, কোনো বইয়ে

ঢুকিয়ে দিয়ো না কিন্তু—লুকিয়ে রইলুম এক ময়রানীর শাড়ির ভাঁজে—সে স্বপ্নেও ভাবলে না কতখানি সে লুকিয়ে রেখেছে। শুধু সন্ধের পর বেরোতাম, ছুটে বেড়াতাম পথে-পথে চাঁদের আলোয়, লম্বা হয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াতাম ; পিঠে চমৎকার সুড়সুড়ি লাগত। এদিকে ছুটি, ওদিকে ছুটি ; সবচেয়ে উঁচু জানলা দিয়ে বড়ো বড়ো ঘরের মধ্যে তাকাই, সেখানে আর-কেউ তাকাতে পারে না ; আর এমনি করে আমি যা দেখেছি কেউ তা দেখতে পারে না, কারো দেখা উচিতও নয়। মোটের উপর পৃথিবীটা খারাপই—যে যা-ই বলুক ; খানিকটা বড়োমানুষ না হতে পারলে আমি তো ভাই, মানুষ হতেই রাজি হতাম না। মেয়ে আর পুরুষ, বাপ-মা আর তোমার "ছোট্ট ফুটফুটে খোকা-খুকুদের" মধ্যে এমন সব কাণ্ড আমি দেখেছি যা বললে বিশ্বাস করবে না। আমি যা দেখেছি তা কেউ জানে না, কিন্তু জানতে চায় সবাই—অর্থাৎ কিনা পাড়া-পড়শিদের যত কেলেঙ্কারি। আমি যদি কোনো খবরের কাগজে লিখতাম, কী কাটতি হত সে-কাগজের! কিন্তু কোনো কাগজে না লিখে আমি সোজা ঠিক-ঠিক জায়গাতেই চিঠি লিখতে লাগলুম, যে-শহরেই আমি যাই, সেখানে সবাই ভয়ে জড়োসড়ো। আমাকে এত ভয় পেলে তারা যে ভয়ে-ভয়ে ভালবাসতে আরম্ভ করল ; অধ্যাপক মশাই আমাকে অধ্যাপক বানিয়ে দিলেন, দরজি দিলে নতুন জামা-কাপড় (দেখছ তো পোশাকের ঘটা!), রাজার টাঁকশালের নায়েব দিলেন আমাকে টাকা তৈরী করে ; মেয়েরা সবাই বলাবলি করলে আমি ভারি সুপুরুষ—এমনি করে আমি উঠলাম মানুষ হয়ে, যাকে তুমি দেখছ। আচ্ছা এখন তাহলে আমি আসি। এই রইল আমার ঠিকানা : গরমের দেশেই আমি থাকি, কিন্তু বর্ষা পড়লেই দেশে ফিরে আসি।'

এই বলে ছায়া চলে গেল।

কাটল দিন, কাটল বছর, অনেক বছর, তারপর ছায়া আবার এল।

'কেমন যাচ্ছে?'

পণ্ডিত বললেন, 'এই যে, এসো। আমি একখানা বই লিখেছি, তার বিষয় হচ্ছে সত্য, শিব আর সুন্দর। কিন্তু—কী বলব তোমাকে—কেউ শুনতে চায় না এ-সব কথা। মনটা বড়ো খারাপ লাগে সেইজন্যে।'

ছায়া বললে, 'আরে ওই তো তোমার ভুল! আমি কখনো মন-খারাপ করি নে। আমি দিন দিন মোটা হচ্ছি আর ফুর্তিবাজ হচ্ছি—সকলেরই তা-ই হবার চেষ্টা করা উচিত। তুমি পৃথিবীর কী জানো, কতটুকু বোঝো—এই তো কোণে পড়ে থেকে রোগা হচ্ছে। মাঝে-মাঝে বেড়াতে গেলেই পারো! এই গ্রীষ্মে আমি একটু বেরুব ভাবছি, তুমি এসো না আমার সঙ্গে। একজন পথের সঙ্গী পেলে বড়ো ভালো হয় আমার, তুমি কি আসবে আমার সঙ্গে আমার ছায়া হয়ে? তুমি সঙ্গে গেলে বেশ খুশিই হই আমি—সব খরচপত্র দেব।'

'অনেক দূরের দেশে যাবে নাকি?' পণ্ডিত জিগেস করলেন।

'যেমন মনে করো', ছায়া জবাব দিলে : 'খানিকটা ঘুরে এলে খুব ভালো হবে তোমার। হবে নাকি আমার ছায়া?—তাহলে পথে-ঘাটে যা-কিছু তোমার দরকার সব পাবে।'

'তোমার ছায়া! কেমন একটু বাড়াবাড়ি ঠেকছে না?'

'কী আর করবে? পৃথিবীর নিয়মই এই, এবং এ-ই থাকবে।' বলে ছায়া চলে গেল।

এদিকে পণ্ডিতটির দিন মোটেও ভালো কাটল না। অনেক বিপদ এল তাঁর, নানারকম দুঃখকষ্ট ; আর সত্য, শিব, সুন্দর সম্বন্ধে যে-সব কথা তিনি বললেন বেশির ভাগ লোক তার ঠিক ততটা আদর করলে গোরু যতটা আদর করে সন্দেশের। শেষ পর্যন্ত তাঁকে শক্ত ব্যামোয় ধরল।

'তুমি তো শুকিয়ে একেবারে ছায়া হয়ে যাচ্ছো,' লোকে বলাবলি করলে। আর কথাটা শুনে তাঁর সমস্ত শরীর দিয়ে একটা কাঁপুনি নেমে গেল, কথাটার যেন কী-একটা বিশেষ-রকমের অদ্ভুত অর্থ আছে।

ইতিমধ্যে ছায়া একদিন বেড়াতে এসে বললে, 'আরে করছ কী! কিছুদিন চেঞ্জে না-গেলে তো মরেই যাবে! আর কেউ নেই তোমাকে সাহায্য করবার—তাতে কী, আমিই তো আছি। তোমার সঙ্গে এত দিনের আলাপ—আমিই তোমাকে নিয়ে যাব সঙ্গে করে। দেব আমি সব খরচ, তুমি বসে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখবে—তা শুনে আমার সময় কাটবে। আমারও ইচ্ছে একটু সমুদ্রের ধারে যাই। আমার দাড়িটা ঠিক ভালো-রকম গজাচ্ছে না—এটাও এক রমের অসুখ বইকি। নাও, আর আপত্তি করো না, চল আমার সঙ্গে। বন্ধুর মত একসঙ্গে বেড়াব আমরা।'

গেল তারা বেড়াতে। এখন ছায়াই প্রভু, আর প্রভুটি ছায়া : গাড়িতে তারা একসঙ্গে, ঘোড়ায় তারা একসঙ্গে, হাঁটে তারা পাশাপাশি—সূর্য কখন কোথায় সে বুঝে ছায়া আগে দাঁড়ায় কি পিছনে সরে আসে। ছায়া ঠিক জানে, কখন সুবিধে বুঝে উপরওলার জায়গা নিতে হয়। পণ্ডিত অবিশ্যি এ-সমস্ত কিছুই লক্ষ করলেন না, মনটা তাঁর বড়ো ভালো ; আর তা ছাড়া, স্বভাবটাই এমন যে লোককে সহজেই আপন করে নিতে পারেন। তাই তিনি ছায়াকে বললেন, 'আমরা তো বলতে গেলে ভাইয়েরই মতো—এতদিন একসঙ্গে ঘুরলাম আর ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গেই তো বড়ো হয়েছি—আমাদের "তুই" বললেই মানায় যেন। অনেক আপন আপন শোনায়।'

ছায়া—আসলে সে-ই তো প্রভু—ছায়া বলল, 'বলেছ বটে একটা কথা! ভালো করে পষ্টাপষ্টিই বলেছ। আমিও ভালো করে পষ্টাপষ্টি বলছি শোনো ঃ তুমি তো মস্ত পণ্ডিত—মানুষের চরিত্রের রহস্য তোমার ভালো করেই জানা আছে। কোনো-কোনো লোক আছে যারা ব্রাউন পেপারের গন্ধ একেবারেই সইতে পারে না, কাছে আনলেই বমি আসে। আবার কেউ কেউ কাচের উপর পেরেক দিয়ে আঁচড় কাটলে

হাড়ে-হাড়ে শিউরে ওঠে। তেমনি, আমাকে কেউ "তুই" বলে ডাকলে আমি একেবারেই সইতে পারি নে, সমস্ত গা রী-রী করে ওঠে। প্রথম যখন আমি তোমার সঙ্গে ছায়া হয়ে ছিলুম তখন আমার ওইরকম হত। বুঝলে—এটা দেমাক নয়, মনের একটা ভাব। তুমি আমাকে "তুই" বলবে, এ কিছুতেই হতে পারে না ; তবে আমার অবিশ্যি তোমাকে "তুই" বলতে আপত্তি নেই—তাতে তোমার ইচ্ছার অর্ধেকটা তো পূর্ণ হবে! আর দেখো, তুমি বরঞ্চ আমাকে আপনিই বল—সেটাই ভালো শোনাবে।'

এরপর থেকে ছায়া তার পুরোনো প্রভুকে "তুই" বলতে লাগল।

'একটু বাড়াবাড়ি হয়ে পড়ছে না?' পণ্ডিত মনে মনে ভাবলেন। 'সে বলছে "তুই" আর আমি বলছি "আপনি"!' কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে তাই মেনে নিতে হল।

এল তারা এক সমুদ্রের ধারে, সেখানে এসেছে অনেক দেশ থেকে অনেক লোক, তাদের মধ্যে এক রাজকন্যা। এখন, এই রাজকন্যার একটা অসুখ ছিল এই যে তিনি চোখে বড্ড বেশি দেখতেন—আর তাতে বড়ো অসুবিধে হত তিনি দেখামাত্র বুঝতে পারলেন যে নতুন যারা এসেছে তারা অন্য সকলের চাইতে বিশেষ একটু আলাদা ধরনের।

'লোকে বলছে বটে যে উনি ভালো করে দাড়ি গজাবার জন্যে এখানে এসেছেন, কিন্তু আসল ব্যাপারটা আমি বুঝতে পেরেছি—ওঁর ছায়া পড়ে না।' রাজকন্যার কৌতূহল হল, তিনি সমুদ্রের ধারে বেড়াতে-বেড়াতে নতুন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলেন। রাজার মেয়ে তিনি, কাউকে বেশি খাতির করে চলবার অভ্যেস তাঁর নেই, তাই তিনি সোজাসুজি বলে দিলেন :

'আপনার অসুখ তো এই যে আপনার ছায়া পড়ে না?'

'রাজকন্যা এরই মধ্যে অনেকটা আরোগ্য লাভ করেছেন দেখছি', ছায়া তৎক্ষণাৎ জবাব দিলে। 'আমি জানি আপনার অসুখটা এই যে আপনি চোখে বড্ড বেশি দেখেন, কিন্তু সেটা অনেক ক'মে গেছে, দেখছি। ছায়া আমার আছে, তবে ছায়াটি কিছু অদ্ভুত গোছের। ঐ যে লোকটি সব সময় আমার সঙ্গে-সঙ্গে ঘোরে তাকে দেখেছেন তো? অন্য সকলেরই দেখবেন সাধারণ ছায়া, আমি কিন্তু সাধারণ জিনিস ভালবাসি নে। অনেক সময় আমরা চাকরদের পোশাক নিজের পোশাকের চেয়েও ভালো কাপড় দিয়ে তৈরী করাই, তেমনি আমিও আমার ছায়াকে আলাদা একজন মানুষের মতো সাজিয়ে দিয়েছি—তা তো বটেই, এমনকি, তার আলাদা একটা ছায়াও রেখে দিয়েছি কখনো-কখনো। অনেক খরচ পড়েছে তাতে—কিন্তু অদ্ভুত জিনিসই আমি ভালবাসি।'

'তাই তো!' রাজকন্যা মনে-মনে বলে উঠলেন। 'সত্যি কি তবে আমি ভালো হয়ে গেলাম? এত ভালো চেঞ্জের জায়গা আর পৃথিবীতে নেই, সমুদ্রের হাওয়ার আজকাল অদ্ভুত গুণ। নাঃ—শিগগির এখান থেকে নড়ছি নে আমি, এখনই তো

ফুর্তি জমবে। এই বিদেশী রাজপুত্রটি—উনি রাজপুত্র না-হয়েই যান না—ভারি চমৎকার লোক। এখন ওঁর শিগগির দাড়ি না-গজালেই বাঁচি—তাহলেই তো উনি চলে যাবেন।

সে-সন্ধ্যায় রাজকন্যা আর ছায়া প্রকাণ্ড জমকালো নাচ-ঘরে একসঙ্গে নাচল। রাজকন্যা খুব হালকা, কিন্তু ছায়া তাঁর চেয়েও হালকা, এমন চমৎকার নাচিয়ে তিনি কখনো দেখেন নি। তিনি বললেন তাকে নিজের দেশের কথা ; ছায়া চেনে সে-দেশ, সে গেছে সেখানে, কিন্তু ঠিক এমন সময়ে, রাজকন্যা যখন সেখানে ছিলেন না। সে তাঁর প্রাসাদের জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখেছে, দেখেছে নিচে থেকে, দেখেছে উপর থেকে ; অনেক ঘটনা সে জানে। রাজকন্যার কথা সে সব বুঝল, তাতে তিনি খুব অবাক হলেন। বড়ো শ্রদ্ধা হল তার বিদ্যেবুদ্ধি দেখে ; এমন চতুর লোক পৃথিবীতে আর আছে বলে তাঁর মনে হল না। আর একবার তার সঙ্গে নেচেই তাঁর মনে হল যে বিয়ে যদি করতেই হয় তো এই রকম মানুষকে। ছায়া তাঁর চোখের দিকে তাকিয়েই তাঁর মনের ভাব বুঝতে পারলে। আর-একবার নাচল তারা, তার পরেই রাজকন্যা প্রায় বলে ফেলেছিলেন—কিন্তু তক্ষুনি তিনি সাবধান হয়ে গেলেন : মনে পড়ল তাঁর নিজের দেশের কথা, কত বড়ো তাঁর রাজত্ব, কত অসংখ্য তাঁর প্রজা!

'উনি খুব চতুর মানুষ ঠিকই', রাজকন্যা ভাবলেন। 'নাচতেও পারেন চমৎকার, সেটাও কম গুণের কথা নয়। কিন্তু যেটা খাঁটি এবং গভীর জ্ঞান, সেটা তাঁর আছে তো? সেটাই আসল কথা, তার যাচাই না-হলে চলবে না।'

কথাটা মনে হতেই তিনি ছায়াকে এমন একটা শক্ত প্রশ্ন করে বসলেন যার উত্তর তিনি নিজেও জানতেন না। ছায়া কিছু না-বলে শুধু মুখ বাঁকাল।

'কই, উত্তর দিলেন না আমার প্রশ্নের?'

ছায়া বললে, 'ওটা আমি শিখেছিলুম ছেলেবেলায় ; দরজার বাইরে ওই যে আমার ছায়া দাঁড়িয়ে আছে, সে-ও উত্তরটা জানে বোধ করি।'

'আপনার ছায়া জানে! তাই তো, বড়ো আশ্চর্য!'

'সে জানেই এ-কথা জোর করে বলতে পারি নে, তবে জানে বলেই আমার মনে হয়। কিন্তু রাজকন্যাকে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। মানুষের মতো সেজে-সেজে আমার ছায়ার দেমাক এত বেড়ে গেছে যে ওর সঙ্গে ঠিক মানুষের মতোই চলতে হবে। নয়তো ওর মেজাজ যাবে বিগড়ে, আর মেজাজ বিগড়োলে ঠিক উত্তরও হয়তো দেবে না।'

'বেশ তো।'

দরজার কাছে দাঁড়ানো পণ্ডিতের কাছে গেলেন রাজকন্যা, গিয়ে অনেকগুলো প্রশ্ন করলেন—চাঁদের আর সূর্যের কথা, আর সবুজ বনের, আর দেশের আর দূর বিদেশের মানুষের কথা ; পণ্ডিত সবগুলোরই ঠিকঠাক চমৎকার জবাব দিলেন।

তখন রাজকন্যা ভাবলেন, 'ছায়াই যাঁর এত বিদ্বান তিনি নিজে না জানি কী! এঁকে বিয়ে করলে আমার প্রজারা প্রাণ খুলে আমাকে আশীর্বাদ করবে—তা-ই করব আমি।'

দু' জনের মধ্যে শিগগিরই সব ঠিক হয়ে গেল। কথা হল, রাজকন্যা দেশে না-ফেরা পর্যন্ত কাউকে কিছু জানানো হবে না।

ছায়া বললে, 'কাউকে নয়, আমার ছায়াকেও নয়।' বিশেষ কারণ ছিল সে-কথা বলবার।

তারপর তারা এল রাজকন্যার নিজের দেশে, যেখানে তাঁর নিজের বাড়ি।

ছায়া বললে পণ্ডিতকে ডেকে : 'শোনো বন্ধু, মানুষের পক্ষে যত উঁচুতে ওঠা সম্ভব, আমি এখন তা-ই উঠেছি—তোমার জন্যে বিশেষ কিছু করতে চাই! তুমি আমার সঙ্গে থাকবে রাজপ্রাসাদে, বেড়াবে আমার আট ঘোড়ার গাড়িতে, ইনাম পাবে বছরে এক লাখ টাকা ; কিন্তু একটা কথা—সবাই তোমাকে ছায়া বলে ডাকবে, তাতে আপত্তি করলে চলবে না, এ-কথা কেউ যেন জানতে না পারে যে তুমি কখনো মানুষ ছিলে। আর, বছরে একবার, যখন আমি সব প্রজাদের চোখের সামনে বারান্দায় বসব, তুমি গুটিসুটি হয়ে আমার পায়ের নিচে পড়ে থাকবে—ঠিক ছায়াটির মতো। কারণ আসল কথাটা এই যে, রাজকন্যার সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিকঠাক—কাল হবে বিয়ে।'

'এটা বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে,' পণ্ডিত বলে উঠলেন। 'কিছুতেই এটা হতে দিতে পারি নে, কিছুতেই না। তুমি যে রাজকন্যাকে আর দেশসুদ্ধ লোককে ঠকাতে বসেছ! বলে দেব, সব বলে দেব আমি—তুমি যে আসলে ছায়া, কাপড়-চোপড়টা শুধু মানুষের।'

'কেউ বিশ্বাস করবে না', ছায়া বললে। 'সাবধান, বলে দিচ্ছি, নয়তো সেপাই ডাকব।'

'যাব আমি সোজা রাজকন্যার কাছে', পণ্ডিত বললেন।

'তোমার আগে যাব আমি,' ছায়া বললে। 'তারপর তুমি যাবে জেলে।'

হলও তা-ই। সেপাইরা সব ছায়ার কথাই শুনল, কেননা সবাই জানে যে রাজকন্যার সঙ্গে তার বিয়ে হচ্ছে।

'তুমি কাঁপছ যে?' রাজকন্যা ছায়াকে দেখে বলে উঠলেন। 'কিছু হয়েছে নাকি? আজ তোমার অসুখ করলে চলবে কেন—কাল যে আমাদের বিয়ে!'

'উঃ, এমন সাংঘাতিক কাণ্ড যে ঘটতে পারে কখনো ভাবি নি! ভাব একবার—হালকা মাথায় বেশি বিদ্যে ধরবে কেন?—ভাব একবার, আমার ছায়া বেচারা গেছে পাগল হয় : তার ধারণা হয়েছে সে সত্যি-সত্যি একজন মানুষ, আর আমি—কী কাণ্ড!—আমিই তার ছায়া!'

'কী ভয়ানক ব্যাপার, তাই তো! ওর হাত-পা বেঁধে রাখা হয়েছে তো?'

'তা তো হয়েইছে। বেচারা আর বুঝি ভালো হবে না!'

'বেচারা! ওর কপালটাই খারাপ। আমার তো মনে হয় ওর এই কষ্টের জীবন থেকে মুক্তি দিলেই ওর প্রতি সবচেয়ে দয়া করা হবে। তা ছাড়া, আজকালকার দিনে দেখছি ছোটোরা বাগে পেলেই বড়োদের ঘাড়ে চড়ে বসতে চায়—সেইজন্যে ওকে চুপচাপ পথ থেকে সরিয়ে দেয়াই দরকার।'

'বড়ো কষ্ট হয়, এতদিনকার পুরোনো চাকর!' বলে ছায়া দীর্ঘশ্বাস ফেলবার ভান করলে।

'মহৎ তুমি!' এ-কথা বলে রাজকন্যা তাকে প্রণাম করলেন।

পরের সন্ধ্যায় সমস্ত শহর পরল আলোর মালা, ছুটল বন্দুক—গুম্‌গুম্‌!—সেপাইরা জমকালো কুচকাওয়াজ করলে। বাস রে, বিয়ে বটে একখানা! রাজকন্যা আর ছায়া একসঙ্গে দাঁড়াল খোলা বারান্দায়, প্রজারা নিচে দাঁড়িয়ে উল্লাসে অভিনন্দনে আকাশ ফাটিয়ে দিলে।

এত উৎসবের কথা পণ্ডিত অবিশ্যি কিছুই জানলেন না, কেননা তার আগেই তাঁর ফাঁসি হয়ে গেছে।

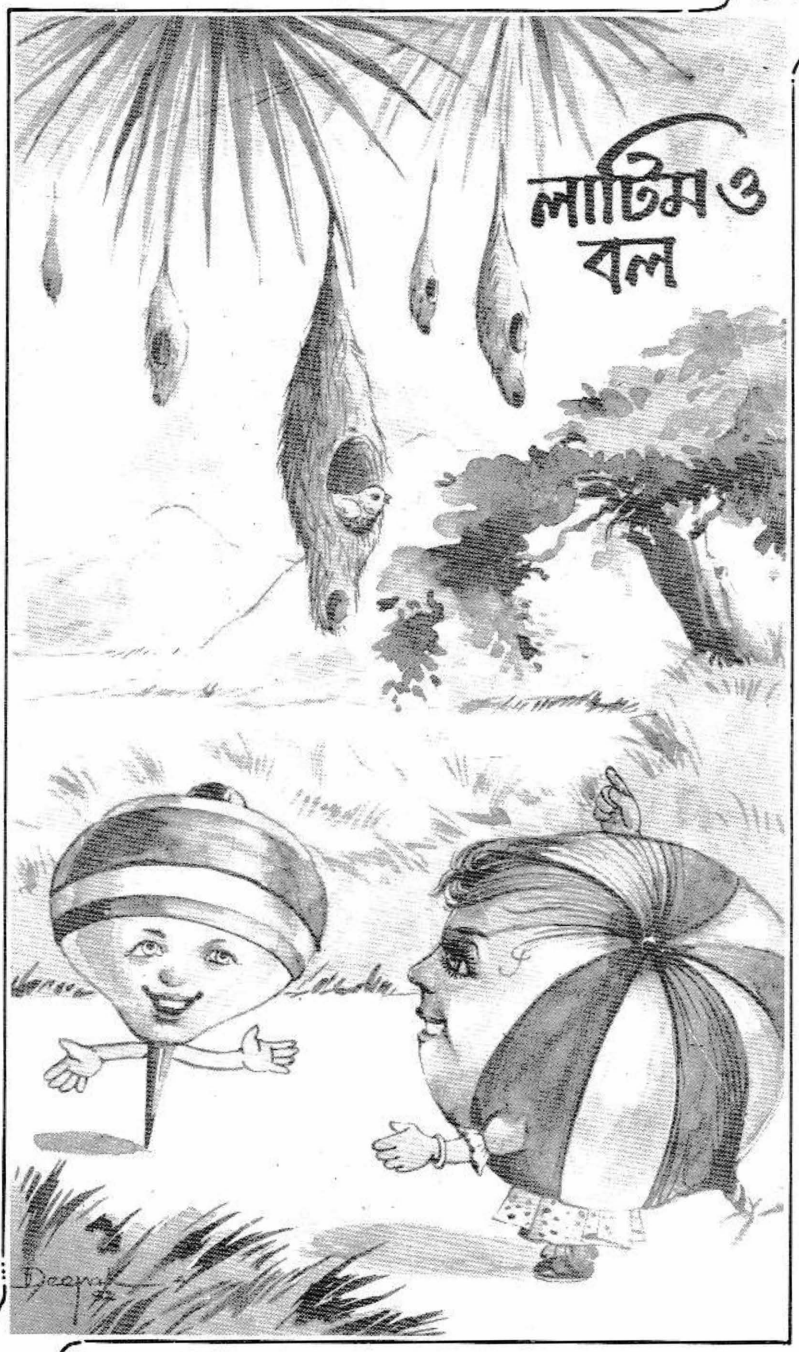
লাটিম ও
বল

দেরাজে যত খেলনা, তার মধ্যে সবচেয়ে কাছাকাছি একটা বল আর একটা লাটিম।

বললে লাটিম বলকে :

'এত কাছাকাছিই যখন থাকি দু' জনে, এসো না আমরা বিয়ে করি।'

এদিকে বল মরক্কো চামড়ায় তৈরী ; তার ধারণা সে মস্ত ঘরের মেয়ে, ও-কথা কানেই তোলে না।

এ-সব খেলনা যে-ছেলেটির, পরের দিন সে এসে লাটিমটা বার করে নিয়ে তাকে লাল আর হলদে রং করে দিলে, তারপর তার মাঝখান দিয়ে নতুন পেতলের পেরেক ঠুকে দিলে। তারপর সেই লাট্টু যখন ঘুরল—সে এক দেখবার জিনিস।

বলকে ডেকে সে বললে, 'দেখো আমাকে, দেখো একবার! কী বল তুমি এখন? করবে বিয়ে? দু' জনে মানাবে চমৎকার—তুমি পারো লাফাতে, আমি পারি ঘুরতে, আমাদের মতো সুখী স্বামী-স্ত্রী খুঁজে বার করা সহজ হবে না।'

বল বলে উঠল, 'বটে? আমার মা-বাবা ছিলেন মরক্কো চামড়ার চটি, সে-খেয়াল আছে তোমার? আর আমার শরীরের মধ্যে আস্ত একটা 'কর্ক' আছে, জানো?'

লাট্টু জবাব দিলে, 'তা তো জানি। আমিও মেহগিনি কাঠের তৈরী—নায়েব মশাই নিজের হাতে আমাকে বানিয়েছিলেন। লাটিম তৈরী করা তাঁর পেশা, জানো তো!'

'সত্যি নাকি?'

'যদি মিথ্যে বলি, আর যেন জীবনে না-ঘুরি!'

'ভেবে দেখব তোমার কথা,' বল বললে—'কিন্তু কি জানো, এক বাবুইকে আমি প্রায় কথা দিয়ে ফেলেছি। যখনই আমি লাফিয়ে আকাশে উঠি, সে তার বাসা থেকে মুখ বার করে বলে—"আমাকে বিয়ে করবে?" মনে-মনে আমি হ্যাঁ বলেছি—আর মনে-মনে হ্যাঁ বলাও যা, মুখে বলাও তা-ই। তবে একটা কথা তোমাকে বলি, তোমাকে আমি কখনো ভুলব না।'

'মস্ত লাভ হবে তাতে!' বললে লাটিম। তারপরে আর এ নিয়ে কোনো কথা হল না।

পরের দিন বলকে নিয়ে যাওয়া হল বাইরে। কী তার লাফ! লাটিম তাকিয়ে দেখলে, সে পাখির মতো আকাশে উড়ে গেল, এত উঁচুতে আর দেখা যায় না। তারপর ফিরে এল, কিন্তু যতবার সে মাটি ছোঁয়, ততবার দ্বিগুণ লাফিয়ে ওঠে। এই লাফের হেতু হয়ত সেই বাবুই পাখি, নয়তো তার শরীরের ভিতরের আস্ত কর্কটা।

কিন্তু ন' বারের বার সে আর ফিরে এল না। ছেলেটি তাকে অনেক খুঁজলে, পাওয়া গেল না।

'জানি নে কোথায় আছে'—দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবলে লাটিম—'গেছে বাবুইএর বাসায়, সেখানে তার বিয়ে হচ্ছে।' লাটিম যতই কথাটা ভাবলে, ততই বসকে তার আরো বেশি সুন্দর মনে হতে লাগল ; সে যে তাকে পাবে না, এতে তার মন আরো বেশি করে বলের দিকে ঝুঁকল। তাকে ফেলে কিনা আর একজনকে—! এ সে কখনো ভুলবে না। লাঠিম বন বন করে, গুনগুন করে, কিন্তু তার বলের কথা কখনো ভুলতে পারে না। বছর কাটে, আরো বছর কাটে, তবুও লাটিম সেই বলেরই আরাধনা করে।

এতদিনে লাটিমের অবিশ্যি বয়েস বেড়েছে, তাকে আর ছোকরা বলা চলে না। হলে হবে কী, একদিন তার সারা গায়ে এমন সুন্দর সোনালি রং করা হল যে এত সুন্দর তাকে কখনোই দেখায় নি। সে এখন গিল্টি করা লাট্টু—আর কী ঘোরাই সে ঘুরলে সারাক্ষণ গুন গুন গান করে-করে—সত্য, এমন আর কখনো কেউ দেখে নি। কিন্তু হঠাৎ একবার সে অনেকটা দূর লাফিয়ে উঠল, তারপর— যাচ্চলে! কত খুঁজল তারা, দিন ভরে খুঁজল—কোথাও তাকে পাওয়া গেল না।

কোথায় সে?

সে লাফিয়ে গিয়ে পড়েছে একটা পিপের মধ্যে। পিপেটা হাজার রকমের 'রাবিশে' ভরা—তরকারির খোসা, ঘর-ঝাঁট দেওয়া ময়লা, ভাঙা শিশি-বোতল—নর্দমা থেকে সব গড়িয়ে পড়েছে।

'হায়রে, এখানে থেকে-থেকে আমার এমন গিল্টি রংটাই না চটে যায়! আর কী-সব পাড়াপড়শি এখানে, ছ্যাঃ!' আদ্ধেক চোখ খুলে সে দেখলে লম্বা একটা ফুলকপির ডাঁটা তার ভয়ংকর রকম কাছে পড়ে—এই বুঝি ছুঁয়ে ফেলল! আর চোখে পড়ল একটা অদ্ভুত গোল জিনিস, অনেকটা আপেলের মতো দেখতে। কিন্তু আপেল নয় ওটা, আসলে একটা পুরোনো বল—অনেক বছর নর্দমায় শুয়ে-শুয়ে ভিজে একেবারে চুপচুপে।

গিল্টি-করা লাট্টুর দিকে তাকিয়ে বলটা বললে, 'তবু এত দিনে সমান ঘরের একজনকে পাওয়া গেল—দুটো কথা কয়ে বাঁচব। আমি খাঁটি মরক্কো চামড়ার তৈরী, এক মোক্তারের মেয়ে আমাকে সেলাই করেছিল—আমার ভিতরে আস্ত একটা কর্ক পোরা। এখন অবিশ্যি আমার দিকে কেউ ফিরেও তাকাবে না, কিন্তু একবার এক বাবুই পাখির সঙ্গে আমার বিয়ে প্রায় 'হব-হব' হয়েছিল। তখন পড়ে গেলুম নর্দমায়, পড়ে রইলুম পাঁচ-পাঁচটা বছর—আর এখন ভিজে-ভিজে একেবারে ট্যাশ হয়ে গেছি। এক ভদ্রমহিলার পক্ষে এ কী বিশ্রী অবস্থা, ভাব।'

লাটিম সব শুনলে, কিন্তু একটা কথারও জবাব দিলে না। এতদিন যার জন্যে সে শোক করেছে, তার কথা সে ভাবলে। আর যতই সে শুনল, ততই সে নিশ্চয়ই বুঝতে পারল যে—এ আর কেউ নয়, এ সেই। তারপর বাড়ির ঝি এসে পিপেটা ওল্টাতে যাচ্ছিল, হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'এই যে! পেয়েছি লাট্টু!'

গিল্টি-করা লাট্টুকে সে নিয়ে এল ঘরে—ছেলেটা আবার তাকে ঘোরালে, সবাই আগেকার মতো তাকিয়ে দেখলে, প্রশংসা করলে। কিন্তু বলটার কথা আর শোনা গেল না ; লাটিমও আর কখনো বললে না তার কথা। আগেকার দিনে সে যে বলের জন্যে পাগল হয়ে গিয়েছিল, এখন বুঝি তা মনেও নেই। কী করেই বা মনে থাকতে পারে, বল—যখন লাটিম স্বচক্ষে দেখলে যে পাঁচ বছর ধরে নর্দমার জলে পচে-পচে তার এমন চেহারা হয়েছে যে তাকে দেখে আর চেনাই যায় না?

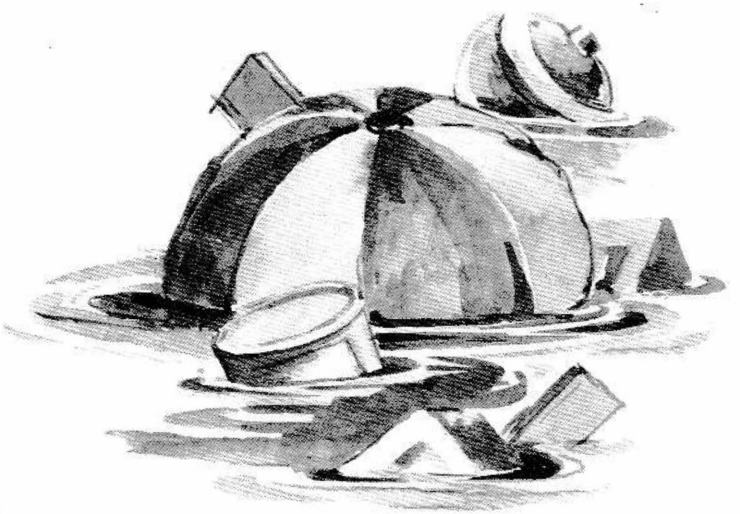

রাজার নতুন পোশাক

এক ছিল রাজা, তাঁর ছিল বেজায় জামা-কাপড়ের শখ। কোনো রাজার শখ থাকে হাতি-ঘোড়া, সৈন্য-সামন্ত নিয়ে যুদ্ধ খেলা ; কোনো রাজার শখ থাকে সোনা-বসানো খাটে শুয়ে গুণীদের গান শোনা—কিন্তু এই যে আমাদের রাজা, তাঁর শখ ছিল সাজগোজের, ছবির মতো সাজতে পারলেই তিনি খুশি। অত যে তাঁর ঐশ্বর্য, তা খরচ হত কেবল জামা-কাপড় কিনে। ঘণ্টায়-ঘণ্টায় নতুন পোশাক চাই তাঁর, সেজেগুজে, গাড়ি চড়ে এক বার ঘুরে আসতে পারলে আর-কিছুই তিনি চাইতেন না। লোকে যেমন বলে, 'রাজা বসেছেন তাঁর সভায়', তাঁর সম্বন্ধে সবাই বলত, 'রাজা আছেন তাঁর সাজ-ঘরে।'

মস্ত শহরে তিনি থাকেন, দিন-রাত সেখানে ফুর্তি আর তামাশা। রোজ লোক আসে দেশ-বিদেশ থেকে। একদিন এল দু' জন জোচ্চোর ; এসেই বলে বেড়াল তারা তাঁতি, এমন মিহি সুতোর কাপড় তারা বুনতে পারে যা কেউ ভাবতেও পারে না। আশ্চর্য তার রং, আশ্চর্য বুনোন। আর সবচেয়ে আশ্চর্য একটা গুণ সে-কাপড়ের—যদি কেউ হয় নিরেট বোকা, কি তার কাজের অযোগ্য, তাহলে তো সে চোখেই দেখতে পাবে না!

'চমৎকার, চমৎকার!' রাজা মনে-মনে ভাবলেন। 'ও-কাপড় যদি আমি পরি, তাহলে বুঝতে পারব আমার রাজত্বে কে-কে আছে অযোগ্য, আর কোনগুলো নিরেট বোকা। কী মজাই হবে তখন! এই কাপড়ই আমার চাই—এক মুহূর্ত দেরি না হয়।'

এই ভেবে তিনি জোচ্চোরদের অনেকগুলো টাকা আগাম দিয়ে দিলেন—এক্ষুনি কাজ আরম্ভ হোক। তারা খাটাল মস্ত দুটো তাঁত, আর এমন ভাব দেখাল যেন সারা দিন সেখানে কাজ করছে। আসলে কিন্তু তাদের তাঁতে মোটেই সুতোর বালাই নেই। তারা চেয়ে নিলে সাত কাহন সোনা আর সাত বস্তা সবচেয়ে দামি রেশম—নিয়ে সেগুলো আত্মসাৎ করলে। তারপর শূন্য তাঁতে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাজ করবার ভান করতে লাগল।

রাজা ভাবলেন, 'দেখে আসি ওদের কাজ কতদূর এগোলো।' কিন্তু যেই তাঁর মনে পড়ল অযোগ্যরা সে-কাপড় চোখে দেখতে পাবে না, কেমন একটু অস্বস্তি লাগল তাঁর। নিজের সম্বন্ধে তাঁর ভয় আছে এ-কথা অবিশ্যি তাঁর মনে হল না। তবু, আর-কেউ আগে গিয়ে এক বার দেখে আসুক না ব্যাপারখানা কী। রাজ্যের সবাই সে কাপড়ের আশ্চর্য গুণের কথা জেনে গেছে ; সবাই ভাবছে—এবার দেখা যাবে অমুক লোক কী ভীষণ বোকা।

রাজা ভাবলেন, 'আমার বুড়ো মন্ত্রীকেই আগে পাঠাবো। তিনি তো খুব বুদ্ধিমান শুনি, আর তাঁর কাজ তাঁর চেয়ে ভালো কেউ বোঝে না। তিনিই ঠিক বুঝবেন, কাপড়টা কেমন হচ্ছে।'

বুড়ো মন্ত্রী গেলেন সেই প্রকাণ্ড বাড়িতে, যেখানে দুই জোচ্চোর বসে-বসে শূন্য তাঁতে কেবলি ঠোকাঠুকি করছে।

'কী কাণ্ড!' বুড়ো মন্ত্রী নিশ্বাস ফেলে চোখ বড়ো করে তাকালেন, 'আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে!' কিন্তু মুখে তিনি সে-কথা প্রকাশ করলেন না।

দুই জোচ্চোর সবিনয়ে তাঁকে কাছে আসতে বললে। 'দেখুন, রংগুলো কি ভালো নয়? বুনোন কি ঠিক হচ্ছে না?' খালি তাঁতটার দিকে বার বার আঙুল দিয়ে দেখাতে লাগল, আর বুড়ো মন্ত্রীর চোখ কেবলি বড়ো হতে লাগল। কিন্তু কিছুই তিনি দেখতে পেলেন না, কেননা দেখবার কিছুই ছিল না তো ওখানে।

'রামচন্দ্র! সত্যি কি আমি এতই বোকা? আমি তো কখনো তা ভাবি নি, লোকেও তা মনে করে না! কী উপায় হবে, লোকে জানলে! আমি মন্ত্রী হবার অযোগ্য? তাই তো, তাই তো!'

এই ভেবে বুড়ো মন্ত্রী তাঁর চশমার ফাঁক দিয়ে মিটমিট করে তাকিয়ে বললেন—

'তোমাদের কাজ খুব ভালো হয়েছে, আমি মহারাজকে এ-কথাই বলব যে আমি দেখে খুব খুশি হয়েছি। চমৎকার রং, আর কী অদ্ভুত কারুকার্য!

'বেশ কথা, সে তো বেশ কথা', জোচ্চোরেরা বললে। তারপর তারা গম্ভীরমুখে রংগুলোর নাম বললে, বিচিত্র নক্‌শাটা বুঝিয়ে দিলে ভালো করে। মন্ত্রী মন দিয়ে সব শুনলেন, তারপর রাজার কাছে গিয়ে সেই কথাগুলোই আউড়ে গেলেন।

এদিকে জোচ্চোরেরা আরো টাকা নিল, নিল আরো সোনা, আরো রেশম। বলল কাপড় বুনতে ও-সব লাগবে। সব তারা থলিতে ভরে রাখলে, এতটুকু সুতোও তাঁতে উঠল না। কিন্তু সেই তাঁতের সামনে বসে তারা একটানা কাজ করে যেতে লাগল।

কয়েক দিন পর রাজা তাঁর একজন খুব বিচক্ষণ পারিষদকে কাপড় দেখতে পাঠালেন। মন্ত্রী যা দেখেছিলেন, ইনিও তা-ই দেখলেন। তাকাতে-তাকাতে তাঁর চোখ ব্যথা হয়ে গেল যেহেতু খালি তাঁত ছাড়া আর কিছু নেই, খালি তাঁত ছাড়া আর কিছু তিনি দেখতে পেলেন না।

'সুন্দর হচ্ছে না জিনিসটা? কী বলেন?' বলে জোচ্চোরেরা নানা দিক থেকে কাল্পনিক কাপড়টা দেখাল, কাল্পনিক নক্‌শাগুলোর ছাঁদ বুঝিয়ে দিলে ভালো করে।

পারিষদ ভাবলেন, 'আমি তো বোকা নই! তবে কি রাজপারিষদ হবার অযোগ্য? কিন্তু এ-কথা তো কেউ কখনো বলে নি। যাই হোক, এদের টের পেতে দিলে চলবে না।' এই ভেবে তিনি সেই অদৃশ্য বস্ত্রের খুব প্রশংসা করলেন—'সুন্দর সুন্দর নক্‌শা!' তারপর রাজার কাছে গিয়ে বললেন, 'মহারাজ, যা কাপড় হচ্ছে আপনার, এমনটি আর কখনো কেউ দেখে নি।'

এতদিন শহরের লোকের মুখে আর কোনো কথা নেই। না জানি কী আশ্চর্য কাপড় বোনা হচ্ছে রাজার জন্যে—এমন আর কি কেউ কোনোদিন দেখেছে?

রাজার খেয়াল হল নিজে গিয়ে এক বার ব্যাপারটা দেখে আসবেন। সাড়া পড়ে গেল শহরে। সঙ্গে গেল তাঁর একদল বাছাই-করা লোক—তার মধ্যে আছেন সেই বুড়ো মন্ত্রী, আছেন সেই বিচক্ষণ পারিষদ। পুরোদমে জোচ্চোররা তখন বুনছে, প্রাণপণে বুনছে—তার না আছে টানা, না আছে পোড়েন।

'কী সুন্দর! না?' বুড়ো মন্ত্রীমশাই আর সেই বিচক্ষণ পারিষদ প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলেন। 'মহারাজ, নক্‌শাটা এক বার দেখুন! আর রঙেরই-বা কী বাহার!' উৎসাহের ঝোঁকে খালি তাঁতটা বার-বার তাঁরা আঙুল দিয়ে দেখাতে লাগলেন—কেননা তাঁরা তো জানেন অন্য সবাই দেখতে পাচ্ছে চমৎকার!

রাজা মনে মনে চমকে উঠলেন। 'কী সর্বনাশ! আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে। কী সর্বনাশ! বোকা নাকি আমি? নাকি রাজা হবার অযোগ্য? এর চেয়ে সর্বনাশ আর কী হতে পারে আমার।' তারপর সবাইকে শুনিয়ে ভারিক্কি চালে বললেন—'খুবই সুন্দর হয়েছে। আমরা সানন্দে এর প্রশংসা করছি।' মৃদুভাবে মাথা নেড়ে গম্ভীরভাবে তিনি শূন্য তাঁতের দিকে তাকালেন—হায়রে। এ-কথা বলবার তাঁর উপায় নেই যে কিছুই তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। সঙ্গে দলবল যারা ছিল তারা চোখ বড়ো করে বার বার তাকাল, কিন্তু অন্যদের চাইতে বেশি দেখতে পেল না তারা। তবু সমস্বরে তারা রাজার কথারই প্রতিধ্বনি করে উঠল, 'খুব সুন্দর তো!' 'কী সুন্দর!' 'কী আশ্চর্য!' 'কী চমৎকার!' এ-সব ছাড়া কারো মুখে অন্য কথা নেই। চারদিকে ফুর্তির বান ডাকল যেন ; সবাই বললে,—'সামনের মাসে রাজপ্রাসাদ থেকে যে-মস্ত মিছিল বেরোবে তাতে মহারাজ এই পোশাকটিই যেন পরেন।' রাজা খুশি হয়ে জোচ্চোরদের উপাধি দিলেন—'তন্তুবায় চন্দ্রকলা।'

কাল মিছিল বেরোবে। সন্ধে থেকে সারা রাত ষোলোটা মোমবাতি জ্বালিয়ে জোচ্চোররা খেটেছে। শহরের লোক দেখছে আর বলাবলি করছে, 'সাবাশ বটে! কাল ভোরের আগে পোশাক এক্কেবারে তৈরী করে দেয়া তো চাই।' জোচ্চোররা এমন ভান করলে যেন তাঁত থেকে কাপড় নামাচ্ছে, প্রকাণ্ড কাঁচি দিয়ে বাতাসকে তারা ফালি করে ফাড়লে ; সুতো-ছাড়া ছুঁচ দিয়ে তারা সেলাই করলে ; তারপর নিঃশ্বাস ছেড়ে বললে, 'পোশাক তৈরী।'

রাজা স্বয়ং এলেন তাঁর জমকালো ঘোড়সওয়ারের দল নিয়ে। জোচ্চোররা কুর্নিশ করে দাঁড়াল, তারপর এমনভাবে হাত তুলল যেন কিছু ধরে আছে 'এই তো ইজের ; আর এইটি কুর্তা, এই চাপকান', এমনি তারা বলতে লাগল। 'মাকড়সার জালের মতো হাল্কা, পরলে মনে হবে না কিছু পরেছেন। কিন্তু সে-ই তো এ-কাপড়ের কেরামতি।'

'ঠিক কথা' বললে ঘোড়সওয়ারের দল। কিন্তু তারা কিছুই অবিশ্যি দেখতে পেল না, যেহেতু দেখবার কিছু তো ছিলই না।

জোচ্চোররা তখন বললে,—'মহারাজা, যদি দয়া করে বস্ত্রত্যাগ করেন, বড়ো আয়নার সামনে নতুন পোশাকটা পরিয়ে দেখিয়ে দিতে পারি।'

মহারাজ তো বস্ত্র ত্যাগ করলেন, আর তারা এক-এক করে নতুন পোশাকের বিভিন্ন অংশ তাঁকে পরিয়ে দেবার ভান করলে ; মহারাজ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঘুরে-ফিরে দেখলেন।

'বাঃ! কী চমৎকার দেখাচ্ছে!' জোচ্চোররা একসঙ্গে বলে উঠল, কি চমৎকার মানিয়েছে। নক্‌শার কী কারুকার্য, রঙের কী বাহার! পোশাক হয়েছে বটে একখানা!'

মিছিলের মালেক এসে বললেন, 'মহারাজ, ছত্রধারীরা বাইরে অপেক্ষা করছে, মিছিল এখনই বেরোবে।'

'আমি তো প্রস্তুত। দেখো তো আমাকে ঠিক মানিয়েছে কিনা?'

বলে রাজা আবার আয়নার দিকে তাকালেন, তাঁর নতুন পোশাক বিশদভাবে অনেকক্ষণ ধরে দেখছেন এমন ভাব করলেন।

বান্দারা নিচু হয়ে মেঝেতে হাত রাখল, তারপর হাত মুঠো করে উঠে দাঁড়াল, যেন রাজার উড়ুনির লুটিয়ে-পড়া আঁচল ধরে রয়েছে। পাছে কেউ লক্ষ করে ফেলে যে তারা কিছুই দেখছে না এই ভয়ে তারা অস্থির।

এমনি করে রাজা বেরোলেন মিছিল করে, মাথার উপরে সোনারুপোর কাজ-করা মণি-মুক্তোর ঝালর-বসানো রাজছত্র। রাস্তার দু'দিকে যত লোক ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল সবাই বলাবলি করলে,—'তুলনা হয় না রাজার এই নতুন পোশাকের! কেমন মানিয়েছে এক বার দেখো!' উড়ুনির আঁচলখানাই-বা কী!' এ-কথা কেউ জানতে দিতে চায় না যে সে নিজে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, কেননা তাহলেই প্রমাণ হবে যে, হয় সে নিরেট বোকা, নয়তো তার কাজের অযোগ্য সে। এত বাহবা রাজার কোনো পোশাকই কখনো পায় নি।

শেষ পর্যন্ত ছোট্ট একটি ছেলে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'ওমা! রাজা দেখছি কিছুই পড়েন নি।' রাজা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'শোনো এক বার বোকা ছেলেটার কথা!'

কিন্তু কথাটা কানাঘুষোয় চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। আস্তে-আস্তে সবাই বলতে আরম্ভ করল,--'আমাদের রাজা দেখি কিছুই পারেন নি!'

ক্রমে কথাটা রাজার কানে কেমন ঠেকল। তাঁর মনে লাগল কথাটা, কেননা তাঁর যেন মনে হল যে কথাটা ঠিক। কিন্তু মনে মনে তিনি ভাবলেন,—'মিছিল করে বেরিয়েছি যখন, যেতেই হবে মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে।' আর বান্দারা আরো বেশি শক্ত করে মুঠি চেপে ধরল ; আঁচলই নেই, অথচ আঁচল ধরে ধরে নিয়ে চলল তারা।

দেশলাইয়ের বাক্স

একটি বড়ো শহর এদেশ থেকে অনেক, অনেক দূরে—পৃথিবীর উত্তরের দেশে, সেখানে দারুণ শীত। সেই দেশের ছোটো একটি মেয়ে শহরের পথ দিয়ে চলেছে একদিন বিকেল বেলায়। ভীষণ শীত, ঝুর ঝুর করে পড়ছে বরফ, অন্ধকার হয়ে আসছে। মেয়েটির মাথায় নেই টুপি, পায়ে নেই জুতো—এদিকে সন্ধ্যা বুঝি হয়ে এল, এ-বছরের শেষ সন্ধ্যা। বাড়ি থেকে যখন সে বেরিয়েছিল, তখনো কি তার পায়ে জুতো ছিল না? ছিল বইকি, কিন্তু কী হবে ও-জুতো দিয়ে? ও যে মস্ত বড়ো, মায়ের পায়ের চটি। অত বড়ো জুতো কি সামলানো যায়? একবার রাস্তা পার হবার সময় দু' দিক থেকে জোরসে হাঁকিয়ে দুটো গাড়ি আসছিল—মেয়েটি পা-হড়কে পড়ে চটি জোড়া হারিয়েছে। একপাটি আর খুঁজেই পাওয়া গেল না, অন্য পাটি মস্ত একটা ছেলে কুড়িয়ে তুলে নিলে। ছেলেটা বুঝি ভাবল, যখন তার নিজের ছেলেপুলে হবে, এটা দিয়ে সে খেলনা করতে পারবে। ছোটো মেয়েটি তাই এখন চলেছে শুধু পায়ে, ঠাণ্ডা লেগে-লেগে ছোটো পা দু'টি দস্তুরমতো নীল হয়ে গেছে। কোমরের সঙ্গে বাঁধা থলিতে তার কতগুলো দেশলাইয়ের বাক্স, হাতে একটা বাণ্ডিল। আজ কেউ তার একটা দেশলাইও কেনে নি, একটা পয়সাও পায় নি সে।

আহা বেচারা! বড়ো খিদে পেয়েছে তার, শীতে কাঁপছে ঠকঠক করে, কত কষ্টে চলেছে সে। বরফ পড়ে-পড়ে লম্বা চুল তার ভরে গেল, কিন্তু এখন চুলের কথা কে ভাবে? রাস্তার দু' ধারে বাড়ির জানালায়-জানালায় আলো জ্বলছে, ভেসে আসছে রোস্ট-হাঁসের অপূর্ব গন্ধ। কাল নববর্ষ কিনা! হ্যাঁ, কাল নববর্ষের দিন—সকলের অত ফুর্তি সেই জন্যেই।

রাস্তার মোড়ে কোনাকুনি দুটো বাড়ি, সেখানে মেয়েটি মাথা নিচু করে বসে পড়ল। পা দু'টি সে টেনে তুলল, তবু যেন আরো বেশি শীত করছে। বাড়ি ফিরতে সাহস হয় না তার, একটা দেশলাইও সে বেচতে পারে নি, একটা পয়সাও সে নিয়ে যেতে পারবে না। বাবা তো ধরে মারবেন—তা ছাড়া, তাদের বাড়ির মধ্যেই প্রচণ্ড শীত। ঘরের চালে কত যে ফুটো তার অন্ত নেই, তার ভিতর দিয়ে হু-হু করে ছুরির মতো হাওয়া এসে ঢোকে। তবু তো মা খড়-ন্যাকড়া দিয়ে বড়ো-বড়ো ফুটোগুলো বুজিয়ে দিয়েছেন।

শীতে তার ছোটো দুটি হাত প্রায় জমে গেছে। ঠিক কথা—একটা দেশলাইয়ের কাঠি বার করে দেওয়ালের সঙ্গে ঘষলেই হয়—তবেই তো সে হাত গরম করতে পারে। তার আঙুলগুলো হিমে ভারি হয়ে বেঁকিয়ে আটকে গেছে, সহজে নড়তে চায় না। আস্তে-আস্তে আঙুলগুলো সে সোজা করল, তারপর বাণ্ডিল থেকে একটা কাঠি বার করে জ্বালাল। ফ্‌ফ্‌ফ্‌—ভোঁশ! দপ করে জ্বলে উঠল আগুন, সুন্দর উজ্জ্বল গরম আগুন, হাত দিয়ে সে আড়াল করছে। ছোট্ট মোমবাতির মতো ছোট্ট আগুন! সত্যি তখন মেয়েটির মনে হল যেন সে বসে আছে সুন্দর সাজানো একটা ঘরে, বসে-বসে আগুন পোয়াচ্ছে। জোরে জ্বলছে ঝকঝকে আগুন—কী আরাম! ঐ যাঃ

—গেল তো ছোট্ট আগুনটুকু নিবে, মিলিয়ে গেল তার গরম ঘরের আরাম ; শুধু ধরা রয়েছে পোড়া কাঠিটা তার আঙুলে।

আর একটা কাঠি বার করে সে দেওয়ালের গায়ে ঘষল। আলো পড়ল দেয়ালে, তারপর দেয়ালটা যেন আস্তে-আস্তে ঘোমটার মতো স্বচ্ছ হয়ে এল, সে দেখতে পেল ভিতরটা। কী মস্ত ঘর! ঐ যে টেবিলটা ধবধবে শাদা কাপড়ে ঢাকা, তার উপর ঝকঝকে রুপোর থালা-বাসন সাজানো—আর মাঝখানে গোল রুপোর থালায় আস্ত একটা হাঁস, এইমাত্র রোস্ট করে আনল, এখনো ধোঁয়া উঠছে, পেটটা আপেল আর শুকনো প্লাম ফলে ঠাশা। তারপর—আরে এ কী! হাঁসটা যে টেবিল থেকে নেমে এল, থপ-থপ পায়ে চলতে লাগল মেঝের উপর দিয়ে, তার বুকের দু' ধারে ছুরি আর কাঁটা বিঁধে রয়েছে! চলতে-চলতে সে এল ছোট্ট মেয়েটির কাছে—সঙ্গে সঙ্গে নিবে গেল দেশলাই ; তার সামনে শুধু সেই মোটা স্যাঁৎসেতে ঠাণ্ডা দেয়াল গ্যাঁট হয়ে দাঁড়িয়ে। আর একটা কাঠি জ্বাললে মেয়েটি। সে বসে আছে অপরূপ একটা ক্রিসমাস-গাছের নিচে—আর একটা ক্রিসমাস-গাছ সে দেখেছিল সদাগরের বাড়ির কাচের দরজা দিয়ে—কিন্তু এটা তার চেয়েও বড়ো, তার চেয়েও সুন্দর। জ্বলছে হাজার মোমবাতি সবুজ ডালে-ডালে—প্রত্যেকটি মোমবাতির গাঁয়ে নানা রঙের নানা রকমের ছবি আঁকা—ও-রকম ছবি সে যেন কোন দোকানে দেখেছে। মেয়েটি হাত বাড়ালে তাদের দিকে—সঙ্গে সঙ্গে কাঠিটা গেল নিবে। মোমবাতিগুলো অনেক, অনেক উঁচুতে উঠতে লাগল যেন। ঐ তো তারা আকাশের তারা হয়ে গেছে। একটা খসে পড়ল, আগুনের লম্বা ল্যাজ আঁকিয়ে বাঁকিয়ে। 'কে যেন মরল।' ছোটো মেয়েটিকে সত্যি সত্যি ভালবাসত এক তার বুড়ি ঠাকুমা, তিনি অনেকদিন মারা গেছেন। তিনি ওকে বলে ছিলেন যখনি একটি তারা খসে, তখনি কেউ-না-কেউ মরে। দেয়ালে আর একটা কাঠি ঘষল মেয়েটি। উজ্জ্বল আলো হয়ে উঠল, আর সেই আলোয়—এ যে পষ্ট ঠাকুমা দাঁড়িয়ে, কী সুন্দর তিনি হয়েছেন দেখতে!

'ঠাকুমা!' মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠল। 'নিয়ে যাও, আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও! তুমি বুঝি এই দেশলাই নিবলেই মিলিয়ে যাবে? কী সুন্দর আগুন দেখলাম, কী মস্ত মোটা হাঁস টকটকে রোস্ট করা, কেমন আলো-জ্বালানো প্রকাণ্ড ক্রিসমাস-গাছ! ওদের মতো তুমিও মিলিয়ে যাবে বুঝি?'

তাড়াতাড়ি একটার পর একটা বাকি সবগুলো কাঠি সে জ্বালাতে লাগল, ঠাকুমাকে ধরে রাখবার জন্যে। কাঠিগুলো এমন জোরে জ্বালাল। যে দুপুরবেলার মতো আলো হয়ে উঠল; কখনো সে দেখে নি তার ঠাকুমাকে এত বড়ো, কি এত সুন্দর। ওকে তিনি কোলে তুলে নিলেন, দু'জনে চলল আলোয় আর আনন্দে উড়ে, পৃথিবী ছাড়িয়ে অনেক উপরে, অনেক দূরে—সেখানে শীত নেই, ক্ষুধা নেই, নেই কোনো কষ্ট—গিয়ে মিশল ঈশ্বরের সঙ্গে।

আর ছোট মেয়েটি দেয়ালে হেলান দিয়ে কোণে বসে রইল, রক্তহীন শাদা তার গাল, ঠোঁটের কোণে তার হাসি, পুরোনো বছরের শেষ সন্ধ্যায় সে জমে মরে গেছে। নতুন বছরের সূর্য উঠল ছোট্ট একরত্তি মৃতদেহের উপর। দেশলাইয়ের বাক্স নিয়ে সে বসে মূর্তির মতো শক্ত আর ঠাণ্ডা। একটা বাণ্ডিল পোড়ানো হয়েছে। 'আহা বেচারা, দেশলাই জ্বালিয়ে গরম হতে চেয়েছিল', লোকে বললে। ওরা কেউ ভাবতেই পারলে না কী সে দেখেছিল, কী সুন্দর, কী অপূর্ব সুন্দর, কী অপূর্ব আনন্দে, কোন্ সুদূর দেশে চলে গিয়েছিল তার ঠাকুমার সঙ্গে, বছরের শেষ সন্ধ্যায়!

লাল জুতো

ছিল এক ছোট্ট মেয়ে—যেমন সে দেখতে সুন্দর, তেমনি সে লক্ষ্মী। হলে হবে কী, সে বেজায় গরিব। গরমের দিনে তার খালি পা ; আর শীতকালে শক্ত কাঠের জুতো পরে-পরে ছোট্ট পা টুকটুকে লাল হয়ে ওঠে।

গ্রামের মধ্যিখানে থাকে এক মুচির বৌ, লাল রঙের পুরোনো কাপড়ের টুকরো দিয়ে সে বসে-বসে ছোট্ট এক জোড়া জুতো তৈরি করলে ; শেলাই তার ভালো হল না, জুতো জোড়া কেমন বেঢপ হয়ে উঠল—তবুও ভালোই বলতে হবে, কেননা সে-জুতো ছোট্ট মেয়েটির জন্যে। মেয়েটির নাম—কারেন।

একদিন মেয়েটির মা মারা গেল। পরের দিনই লাল জুতো জোড়া সে পেয়ে প্রথমবার পড়ল। সেদিনতার মায়ের কবর, ও-রকম শোকের মধ্যে জুতো জোড়া কেমন খাপছাড়া দেখাল। কিন্তু বেচারার আর তো জুতো নেই—লাল জুতো পরে সে চলল মায়ের কফিনের পেছনে পেছনে।

হঠাৎ সে-রাস্তায় এল মস্ত এক গাড়ি, ভিতরে গিন্নি-ঠাকরুন বসে, অনেক তাঁর বয়েস। ছোট্ট মেয়েটিকে দেখে তাঁর দয়া হল। পুরুতকে ডেকে তিনি বললেন—

'এই মেয়েটিকে আমায় দিয়ে দিন, আমি একে মানুষ করি।'

কারেন ভাবলে ইনি বুঝি তার লাল জুতো দেখে খুশি হয়ে তাকে নিতে চাইলেন ; কিন্তু ঠাকরুন বললেন, 'এ কী বদ চেহারার জুতো, এক্ষুনি পুড়িয়ে ফেল!' তারপর কারেনের জন্য ভালো-ভালো সব কাপড়চোপড় এল, তাকে শেখানো হল লেখাপড়া, শেখানো হল শেলাই। যে তাকে দেখলে সে-ই বললে, 'মেয়েটি ভারি লক্ষ্মী।' কিন্তু তার আয়না বললে, 'লক্ষ্মীর চেয়ে ঢের বেশি তুমি, তুমি সুন্দর।'

একদিন দেশের রানী বাইরে বেড়াতে বেরোলেন, সঙ্গে তাঁর ছোট্ট মেয়ে—মেয়েটি অবিশ্যি রাজকন্যা। প্রাসাদের পথে দলে-দলে মেয়ে-পুরুষের ভিড়, তার মধ্যে কারেনও দাঁড়িয়ে। ছোট্ট রাজকন্যা গাড়ির জানলায় এসে দাঁড়াল, যাতে সবাই দেখতে পায়। পরনে তার ধবধবে সাদা মসলিনের পোশাক। গলায় সেই মুক্তোর মালা, মাথায় সেই তার সোনার মুকুট—পায়ে শুধু তার জুতো, চকচকে লাল রঙের মরক্কো চামড়ায়—কোথায় লাগে তার কাছে মুচি-বৌর তৈরি সেই জুতো! সত্যি, লাল জুতোর মতো পৃথিবীতে আর কিছুই নেই।

কারেন বড়ো হয়ে উঠল ; তার জন্যে এল নতুন জামা, নতুন কাপড়—নতুন জুতোও তৈরি করাতে হয়। শহরের সবচেয়ে বড়ো জুতোওলা নিজের বাড়িতে নিজের ঘরে তার ছোট্ট পায়ের মাপ নিলে—আর সে কী ঘর! চারদিকে ঝকঝকে কাচের আলমারি ভরা কত রকমের চকচকে জুতো! এত সুন্দর ঘরটা, অথচ, গিন্নিঠাকরুনের যেন তা চোখেই লাগছে না। আরে—ওই তো এক জোড়া লাল

জুতো, ঠিক রাজকন্যা যে-রকম পরেছিল—কী সুন্দর! জুতোওলা বললে, 'ও-জোড়া রাজার এক ভাই-ঝির জন্যে তৈরি হয়েছিল—মাপ ঠিক হয় নি।'

গিন্নিঠাকরুন বললেন, 'নিশ্চয়ই পেটেন্ট চামড়া—নয়তো এত চকচক করে!'

'ইশ, কী চকচকে!' বললে কারেন। জুতো জোড়া ঠিক লাগল তার পায়ে, কেনা হল।

পরের দিন কারেন গির্জেয় গেল তার নতুন জুতো পরে। এমন লাল জুতো পরে গির্জেয় যেতে নেই, গিন্নিঠাকরুন জানলে পরে কক্ষনো তাকে যেতে দিতেন না। কিন্তু তিনি কিনা চোখে ভালো দেখেন না—রঙটা ঠিক ঠাওরাতে পারেন নি। এদিকে কারেন যখন গির্জেয় ঢুকছে, কবরখানার মূর্তিগুলো থেকে আরম্ভ করে দেয়ালে পুরুতঠাকুরদের ছবি, লম্বা কালো জামা পরা পুরুতগিন্নিরা—সবাই যেন হাঁ করে তার লাল জুতোর দিকে তাকিয়ে রইল। আর তার মনেও লাল জুতো ছাড়া আর ভাবনা নেই। পুরুতঠাকুর কত ভালো-ভালো কথা বলছেন, গম্ভীর সুরে অর্গান বাজছে, ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা টাটকা মিষ্টি গলায় গান করছে—কিন্তু কারেনের মনে শুধু তার লাল জুতোরই ভাবনা।

বিকেলবেলায় গিন্নিঠাকরুনের কানে খবরটা পৌঁছল যে কারেনের জুতোর রঙ ছিল লাল। গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললেন যে কাজটা বেজায় খারাপ হয়ে গেছে। এর পরে কারেনকে কালো জুতো পরেই গির্জেয় যেতে হবে—হোক না সে-জুতো ছেঁড়াখোড়া পুরোনো।

পরের রবিবার গির্জেয় যাবার সময় কারেন তার কালো জুতোর দিকে তাকাল, তারপর তাকাল লাল জুতোর দিকে, তাকাল আরো একবার, তারপর লাল জুতোই পরলে।

চমৎকার রোদ উঠেছে, মাঠের ভিতর দিয়ে পায়ে-চলা পথে কারেন চলেছে গিন্নিঠাকরুনের সঙ্গে। পথে বেজায় ধুলো।

গির্জের দরজায় লম্বা দাড়িওলা বুড়ো এক খোঁড়া ভিখিরি লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে। তার দাড়ি কিন্তু শাদা নয়, লালচে ছিটের—না, একেবারে লাল রঙের। প্রায় মাটি পর্যন্ত মাথা নুইয়ে গিন্নিঠাকরুনকে সে বললে—'আপনার জুতো বুরুশ করে দিই?'

সঙ্গে সঙ্গে কারেন তার পা বাড়িয়ে দিলে।

'বাঃ কী সুন্দর নাচের জুতো', বললে বুড়ো ভিখিরি। 'আঁটো হয়ে বসবে নাচের সময়' বলে সে জুতোর তলায় আঙুল দিয়ে কয়েকবার টোকা দিলে। গিন্নিঠাকরুন তাকে কিছু ভিক্ষে দিলেন, তারপর কারেনকে নিয়ে ঢুকলেন গির্জের মধ্যে।

গির্জের ভেতরে সবাই কারেনের লাল জুতোর দিকে তাকিয়ে রইল হাঁ করে; তাকিয়ে রইল দেয়ালের ছবিগুলো। সকলের সঙ্গে হাঁটু গেড়ে বসে সে কেবল তার লাল জুতোর কথা ভাবলে—ভুলে গেল উপাসনা করতে, ভুলে গেল স্তোত্র গাইতে।

তারপর সকলে গির্জে থেকে বেরুল ; গিন্নিঠাকরুন তাঁর গাড়িতে উঠলেন। কারেনও গাড়িতে ওঠবার জন্যে পা তুলেছে এমন সময় সেই বুড়ো ভিখিরি আবার বললে—

'বাঃ কী সুন্দর নাচের জুতো !'

তখন আর কারেন নিজেকে সামলাতে পারলে না, সে কয়েক বার পা ফেলে ফেলে নাচল। আর একবার যখন নাচতে আরম্ভ করল, নেচেই চলল তার পা। তার লাল জুতো যেন নিজের গরজে নাচছে, তাকে থামাবার ক্ষমতা কারেনের নেই। নেচে-নেচে সে চলে গেল গির্জে ছাড়িয়ে, কিছুতেই থামতে পারলে না, কোচোয়ানকে পিছন পিছন দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরে আনতে হল গাড়ির মধ্যে। তবু তার পা নেচেই চলেছে, নাচতে-নাচতে গিন্নিঠাকরুনকে সে সাংঘাতিক কয়েকটা লাথি মারলে। শেষ পর্যন্ত তার পা থেকে জুতো খুলে নেয়া হল—সঙ্গে সঙ্গে থামল নাচ।

বাড়ি গিয়ে গিন্নিঠাকরুন জুতোজোড়া বাক্সয় তুলে রাখলেন, কিন্তু কারেনের মাঝে মাঝে লুকিয়ে তা দেখা চাই।

তারপর হল কী, গিন্নিঠাকরুনের বেজায় অসুখ করল—তিনি নাকি আর বাঁচবেন না। তাঁর অনেক সেবা-শুশ্রূষার দরকার—আর সেটা কারেনের অবিশ্যি সবচেয়ে বেশি করবার কথা। কিন্তু এদিকে মস্ত নাচ হবে শহরে—কারেনের সেখানে নিমন্ত্রণ। গিন্নিঠাকরুনের দিকে সে একবার তাকালে—যাঁর কিনা বাঁচবার আশা নেই—একবার তাকাল তার লাল জুতোর দিকে, তারপর ভাবলে এতে এমন আর দোষ কী। পরলে সে লাল জুতো—তা না হয় পরলই—কিন্তু লাল জুতো পরে সে গেল নিমন্ত্রণে, গিয়ে নাচতে আরম্ভ করল।

নাচছে তো নাচছে—সে যখন যেতে চায় ডান দিকে জুতো যায় বাঁ দিকে ; সে যখন উঠতে চায় উপরতলায়, জুতো নেমে আসে নিচের দিকে, ঘর পার হয়ে রাস্তায়, রাস্তা পার হয়ে শহরের ফটকে ; তারপর শহর পার হয়ে নেচে-নেচে সে চলে এল একেবারে অন্ধকার বনের মধ্যে।

উপরে, ঘন গাছের ফাঁকে ফাঁকে কী যেন একটা চকচক করছে। একটা মুখের মতো দেখে কারেন প্রথমটায় ভেবেছিল চাঁদ বুঝি। আসলে কিন্তু লাল দাড়িওয়ালা সেই বুড়ো ভিখিরিটা, মাথা নেড়ে নেড়ে সে বলছে :

'কী সুন্দর নাচের জুতো, দেখো !'

তখন কারেন ভয় পেয়ে গেল, খুলে ফেলতে চাইল তার জুতো কিন্তু জুতো শক্ত হয়ে পায়ে আঁকড়ে রইল। সে টেনে ছিঁড়ে ফেললে মোজা, কিন্তু জুতো যেন তার পায়ে শেকড় গজিয়েছে। নাচতে হল তাকে, নাচতেই হল, ঝোপের উপর দিয়ে, মাঠের ভিতর দিয়ে, যখন বৃষ্টি আর যখন রোদ, যখন দিন আর যখন রাত্রি—কিন্তু রাত্রিতেই সবচেয়ে ভয়ানক।

নাচতে-নাচতে সে গেল গির্জের কবরখানায় ; কিন্তু যারা মরে গেছে তারা তো নাচে না, তাদের অনেক ভালো-ভালো কাজ আছে। গরিবদের কবরের উপর ঘন সবুজ ঘাস, সেখানে সে একটু বসতে চাইল : কিন্তু তার জন্যে শান্তি নেই, নেই বিশ্রাম। নেচে-নেচে সে গেল গির্জের খোলা দরজার দিকে, সেখানে লম্বা সাদা-জামা-পরা এক দেবদূত দাঁড়িয়ে, কাঁধ থেকে পা পর্যন্ত তার পাখা, মুখ তার গম্ভীর, হাতে তার ঝকঝকে চওড়া তলোয়ার।

'নাচবি তুই', দেবদূত বললে, 'নাচবি লাল জুতো পরে—যতদিন না তুই ফ্যাকাশে ঠাণ্ডা হয়ে যাস, যতদিন না তোর শরীর শুকিয়ে-শুকিয়ে কঙ্কাল হয়ে যায়। এ-দরজা থেকে ও-দরজায় তুই নেচে বেড়াবি—আর যে-সব বাড়িতে দেমাকি ছেলেমেয়েরা থাকে দরজায় ধাক্কা দিয়ে তুই ডাকবি, যাতে তারা তোকে দেখে ভয় পায়। নাচ, নাচ তুই, নাচ।'

'দয়া করো, দয়া করো', কারেন চিৎকার করে উঠল।

কিন্তু দেবদূত উত্তরে কিছু বললে কিনা সে শুনতে পেল না—কেননা তার লাল জুতো তাকে নাচিয়ে উড়িয়ে নিয়ে গেল—দরজার বাইরে মাঠে, পথের উপর দিয়ে, পাথরের উপর দিয়ে—নাচছে সে, কেবলি নাচছে।

একদিন সকালে একটা দরজার পাশ দিয়ে সে নেচে গেল—সেটা তার চেনা। ভিতর থেকে আসছে স্তোত্রপাঠের শব্দ, ফুল নিয়ে সাজানো একটা কফিন কারা সব বাইরে নিয়ে এল। তখন সে বুঝতে পারলে যে গিন্নিঠাকরুন মারা গেছেন। আর তার মনে হল—সবাই, সবাই তাকে ছেড়ে গেছে, আর তার উপর স্বর্গের দেবদূতের অভিশাপ।

সে নেচে চলল—নাচতেই হল তাকে—নাচল সে রাত্রির অন্ধকারে। তার লাল জুতো তাকে নিয়ে গেল ঝোপঝাড় কাঁটাবনের উপর দিয়ে, গা কেটে তার রক্ত বেরুল, নেচে-নেচে সে গেল পোড়ো মাঠ পার হয়ে একলা ছোট্ট একটা বাড়ির কাছে। বাড়িটা সে চেনে ; সেখানে থাকে একজন লোক, রাজার হুকুমে খারাপ লোকদের মাথা কেটে ফেলা তার কাজ।

সে-বাড়ির জানলার কাছে আঙুল দিয়ে টোকা দিতে-দিতে ডাকলে,—'বেরিয়ে এসো, শিগগির বেরিয়ে এসো ! আমি তো ভিতরে ঢুকতে পারব না, আমাকে নাচতে হচ্ছে !'

লোকটি বললে, 'আমি কে তুমি বোধহয় জানো না ?'

'জানি, জানি। কিন্তু আমার মাথা কেটে ফেল না, তাহলে আমার দোষের জন্য দুঃখ নেবে কে ? কেটে ফেল আমার পা, লাল জুতোসুদ্ধ।'

কারেন তাকে নিজের কথা সব বললে, আর লোকটি কেটে ফেললে তার দুটো পা, জুতোসুদ্ধ। কিন্তু লাল দু'টি জুতো ছোটো দু'টি পাসুদ্ধ নেচে-নেচে উড়ে গেল মাঠের উপর দিয়ে গভীর বনের মধ্যে।

তারপর লোকটি তাকে একজোড়া কাঠের পা তৈরি করে দিলে, দিলে একজোড়া লাঠি, শেখালে স্তোত্র ; তারপর কারেন লোকটিকে প্রণাম করে চলে গেল পোড়ো মাঠ পার হয়ে।

'এখন তো অনেক দুঃখ আমি নিয়েছি', সে ভাবলে। 'এখন আমি যাব গির্জের মধ্যে, সবাই আমায় দেখুক।'

তাড়াতাড়ি সে গেল গির্জের দিকে, কিন্তু দরজার কাছে সেই লাল জুতোজোড়া নাচছে। ভয় পেয়ে সে ফিরে এল।

সারাটা সপ্তাহ সে কাটাল চুপচাপ মাথা নিচু করে, কত কান্নাই যে কাঁদল! তারপর রবিবার এল।

'কম দুঃখ তো পেলাম না—যারা গির্জের মধ্যে গিয়ে মাথা উঁচু করে বসে, তাদের চেয়ে এখন আমি কম কিসে?'

এই ভেবে সে বুক ফুলিয়ে চলল গির্জের দিকে, কিন্তু যেই ফটকের কাছে আসা, অমনি নেচে উঠল জুতো তার চোখের সামনে। আবার ভয় পেয়ে সে এল ফিরে।

তখন সে পুরুতঠাকুরের বাড়ি গিয়ে বললে, 'আমাকে ঝি রাখবে? আমি খুব খাটব, মাইনে চাইনে এক পয়সাও, শুধু তোমাদের মতো ভালো লোকের সঙ্গ পেতে চাই।' পুরুত-গিন্নির দয়া হল, তাকে কাজে নিলেন। মুখ বুজে সারা দিন সে খাটে। বাড়ির ছোটো ছেলেমেয়েরা তার খুব ভক্ত হয়ে পড়ল, সন্ধেবেলায় তাদের সঙ্গে সে গল্প করে। কিন্তু যদি কখনো ভালো চেহারা কি ভালো কাপড়চোপড়ের কথা ওঠে, তক্ষুনি সে চুপ করে যায়।

পরের রবিবার বাড়ির সবাই গির্জেয় গেল। গিন্নি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমিও যাবে, কারেন?' কারেনের চোখ ছলছল করে উঠল, ম্লানমুখে সে তাকিয়ে রইল তার কাঠের পায়ের দিকে। সবাই চলে গেল, সে গিয়ে ঢুকল তার ছোট্ট ঘরটিতে—সেখানে শুধু একটি বিছানা আর একটি চেয়ার। একা সে বসে রইল চুপ করে, বাতাসে ভেসে এল গির্জের অর্গানের শব্দ, চোখ দিয়ে দরদর করে তার জল পড়তে লাগল। ভিজে মুখখানি উপরের দিকে তুলে সে বললে,—'ঈশ্বর, আমায় দয়া কর, দয়া চাই তোমার!'

তারপর সূর্য যেন আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠল, আর তার সামনে এসে দাঁড়াল সেই দেবদূত, শাদা জামা পরা—কিন্তু এখন আর নেই তার হাতে সেই ধারাল তলোয়ার। এখন তার হাতে সবুজ একটি ডাল, তাতে অনেক গোলাপ ফুটে রয়েছে। সে এসে ঘরে কড়িকাঠে হাত রাখল, সঙ্গে সঙ্গে ছাদটা অনেক, অনেক উঁচুতে উঠে গেল, আর যেখানেই সে ছোঁয় সেখানেই একটি সোনালি তারা জ্বলে ওঠে ; সে হাত রাখল দেয়ালে, আর দেয়ালগুলো ছড়িয়ে-ছড়িয়ে দূরে মিলিয়ে গেল, কারেন দেখতে পেল গির্জের ভিতরকার সেই সব পুরুত আর পুরুতগিন্নিদের ছবি, আর গির্জের মধ্যে সবাই হাঁটু গেড়ে বসে গান গাইছে। তার এই ঘরটি ছোট্ট গির্জে হয়ে উঠল যে—

বাড়ির সকলের সঙ্গে যেন সে বসে আছে—ঐ তো পুরুতঠাকুর আর পুরুতগিন্নি গান শেষ করে তার দিকে তাকিয়ে বলছেন—

'ভালো করেছ এখানে এসে, কারেন !'

'ঈশ্বরের দয়া', কারেন বললে।

আর অর্গানে আশ্চর্য গম্ভীর বাজনা বেজে উঠল, আর মধুর হয়ে বেজে উঠল ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের কোমল কণ্ঠস্বর ; কী মধুর রোদ জানলা দিয়ে তার চেয়ারের গায়ে গড়িয়ে এসে পড়েছে ; তার হৃদয় ভরে গেল সূর্যের সোনালী কিরণে আর শান্তিতে আর আনন্দে—যেন আনন্দের চাপে তার বুক ভেঙে যাবে। তারপর সূর্যের আলোর পাখায় সে উড়ে চলে গেল স্বর্গে—সেখানে কেউ তার লাল জুতোর কথা জিগেস করলে না।

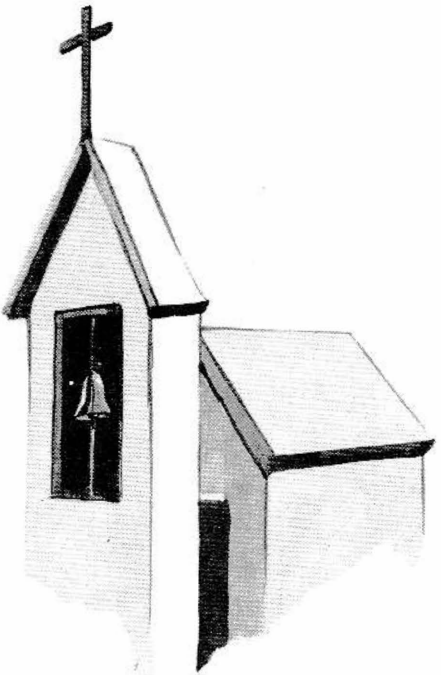

ছোটো-কালু ও বড়ো-কালু

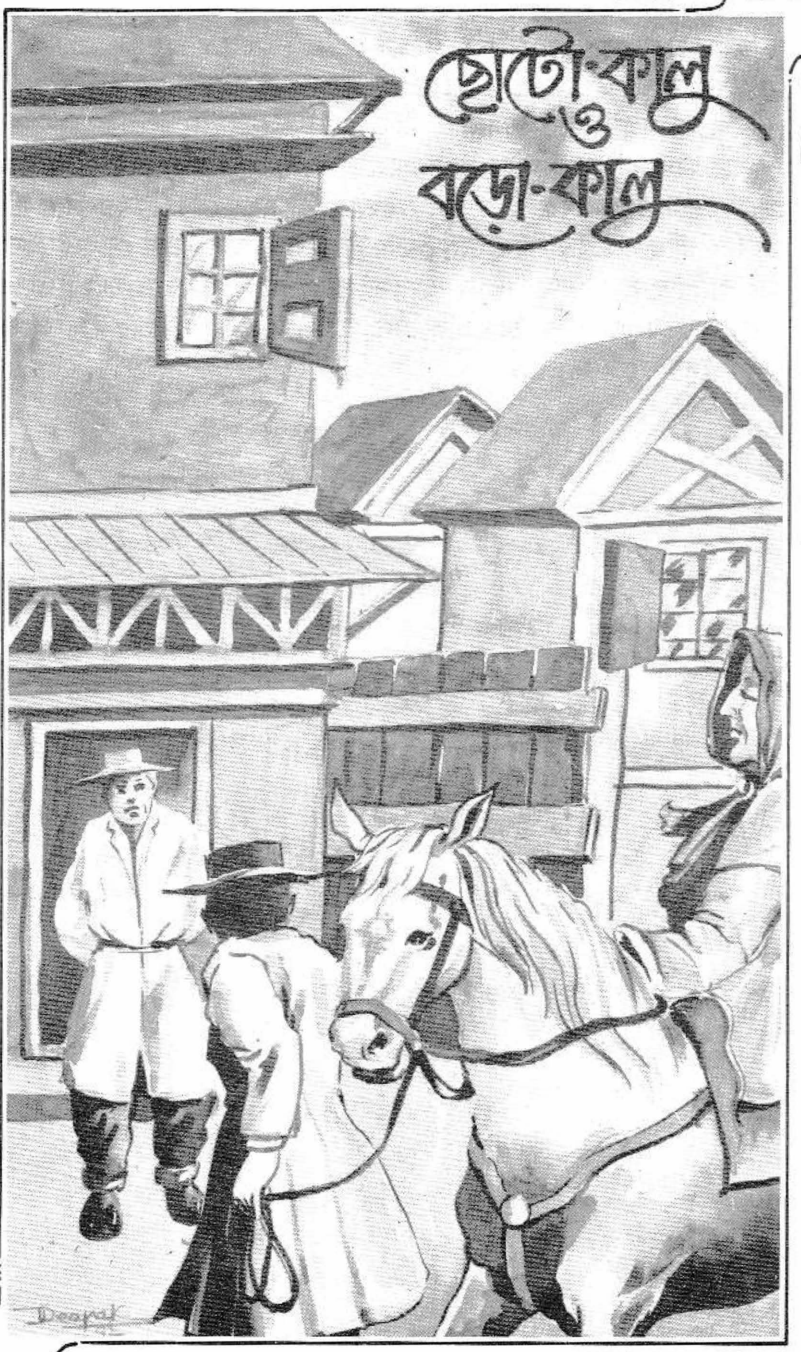

এক গ্রামে ছিল দু' জন লোক, দু' জনেরই এক নাম—দু' জনেরই নাম কালু ; কিন্তু একজনের ছিল চারটে ঘোড়া, আর একজনের শুধু একটা। চারটে ঘোড়া যার, গ্রামের লোক তাকে বলত বড়ো-কালু আর যার একটা ঘোড়া তাকে বলত ছোটো-কালু। এখন গল্পটা মন দিয়ে শোন, কেননা গল্পটা সত্যি।

সপ্তাহের ছ' দিন ছোটো-কালু বড়ো-কালুর জন্যে লাঙল ঠেলে-ঠেলে খেটে মরত, আর তার একটিমাত্র ঘোড়া তাকে ধার দিত ; তারপর বড়ো-কালু ছোটো-কালুকে তার চারটে ঘোড়াই ধার দিত, কিন্তু সে শুধু এক দিন, রবিবারের দিন। হুর্‌র্‌! কী ফুর্তি তার সেদিন! পাঁচ-পাঁচটা ঘোড়ার গায়ে মনের সুখে সে চাবুক চালাত, সেদিনকার মতো পাঁচটা ঘোড়াই তার। ফুর্তিসে রোদ চড়ছে সকালবেলায়, গ্রামের ছেলে-বুড়ো পোশাকি কাপড় পরে হাটের দিকে যেতে-যেতে দেখে ছোটো-কালু পাঁচ ঘোড়া নিয়ে তার খেত চাষ করছে ; কিন্তু তার মনে এত ফুর্তি যে সে থেকে-থেকে ঘোড়াদের গায়ে চাবুক চালাচ্ছে আর হেঁকে উঠছে, 'সাবাশ! আমার পাঁচ ঘোড়া সাবাশ!'

বড়ো-কালু বললে, 'ও-রকম কথা বলতে পারবে না, সাবধান! মোটে তো একটা ঘোড়া তোমার।'

কিন্তু পথ দিয়ে কেউ যখন যাচ্ছে না, ছোটো-কালু সব সাবধান ভুলে গিয়ে আবার হেঁকে উঠল, 'সাবাশ! আমার পাঁচ ঘোড়া, সাবাশ!'

বড়ো-কালু তাড়াতাড়ি বলে উঠল 'ও-রকম কথা আর বলবে না, বুঝলে? ফের যদি তোমার মুখে ও-কথা শুনি তোমার ঐ ঘোড়ার মাথায় এক বাড়ি দিয়ে একদম ঠাণ্ডা করে দেব। বুঝলে?'

'আর কখনো ও-রকম বলবো না,' বললে ছোটো কালু।

বললে হবে কী—যেই না দু'চার জন সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, তাদের বলছে, 'কী ছোটো-কালু, কেমন আছ?' অমনি তার মনে এমন ফুর্তি হল যে সে ভাবল 'তাই তো! খাশা দেখাচ্ছে আমায়, পাঁচ-পাঁচটা ঘোড়া নিয়ে চাষ করছি!' আর অমনি কষে চাবুক মেরে সে হেঁকে উঠল, 'সাবাশ! আমার পাঁচ ঘোড়া, সাবাশ!'

'রোসো, বার করছি তোমার সাবাশটা!' বলতে বলতে বড়ো-কালু মস্ত একটা কুড়ুল তুলে নিয়ে ছোটো-কালুর একটিমাত্র ঘোড়ার মাথায় এমন মারই মারলে যে ঘোড়াটা সেই যে চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ল, আর উঠল না।

'ওমা! এখন তো আমার একটা ঘোড়াও রইল না!' বলে ছোটো-কালু ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

কান্না শেষ হলে সে ঘোড়াটার চামড়া ছাড়িয়ে নিলে, রোদে হাওয়ায় সেটা শুকাল, শুকনো হলে ভরল একটা থলিতে, তারপর থলিটা কাঁধে ফেলে চলল শহরের দিকে ঘোড়ার চামড়া বেচতে।

শহর অনেক দূরের রাস্তা, ছোটো-কালুকে যেতে হল মস্ত ঘন একটা বনের ভিতর দিয়ে। এদিকে ভীষণ ঝড়-বাদলা করে এল, অন্ধকারে সে পথ হারিয়ে ফেলল। ঠিক রাস্তাটা খুঁজে পেতে-না-পেতেই সন্ধে হয়ে এল—এদিকে সে এত দূরে চলে এসেছে যে বাড়ি ফিরবার উপায় নেই তার, রাত পড়বার আগে শহরে পৌছনোও যাবে না।

পথের পাশেই বেশ বড়ো একটা বাড়ি—কোনো সওদাগরের হবে। জানলাগুলো বন্ধ, কিন্তু খড়খড়ির ফুটো দিয়ে আলোর ফিনকি দেখা যাচ্ছে।

'এখানেই রাতটা কাটাতে পারি কিনা দেখি', মনে-মনে এই ভেবে ছোটো-কালু দরজায় টোকা দিলে।

দরজা খুলে দিলে সওদাগরের বৌ। কিন্তু ছোটো-কালুর কথা শুনে সে বললে, 'না না, ও-সমস্ত হবে না, এখান থেকে যাও। আমার স্বামী বাড়ি নেই, অচেনা একটা লোককে আমি বাড়িতে থাকতে দিতে পারব না।'

'তাহলে আমি বাইরেই শোব', ছোটো-কালু বললে। সওদাগরের বৌ কোনো জবাব-না দিয়ে তার মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিলে।

ছোটো-কালু আর কী করে, হাঁ করে বাড়িটর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বাড়িটার শনের চাল, খুব ঢালু হয়ে অনেকখানি নেমে এসেছে। 'বাঃ!' ছোটো-কালু নিজের মনে বললে 'ওখানেই তো আমি শুতে পারি, ওই তো চমৎকার বিছানা। এখন ওই সারসটা উড়ে এসে আমার পায়ে কামড়ে না-দিলেই হয়।' কেননা চালের উপরের দিকে একটা সারস লম্বা ঠ্যাঙে দাঁড়িয়ে, সেখানে বাসা বেঁধেছে।

একটা গাছের ডাল ধরে পা বাড়িয়ে ছোটো-কালু উঠল তো চালের উপর। সেখানে এপাশ-ওপাশ করে মোটে সে একটু আরাম করে নিচ্ছে, এমন সময় তার চোখে আলো লাগল। নিচের দিকে তাকিয়ে সে দেখে—ওমা! ঘরের উপরের দিকে ছোটো একটা জানলা খোলা, আর তার ভিতর দিয়ে স্পষ্ট সে ভিতরটা সব দেখতে পাচ্ছে। মস্ত এক টেবিল, তার উপর ধবধবে সাদা কাপড়—আর কত কী ভালো-ভালো খাবার সাজানো—মাছ, মাংস, মিষ্টি, কত কী! সেখানে বসে আছে সওদাগরের বৌ আর এক পুরুতঠাকুর—আর কেউ নয়। পুরুতঠাকুর ঘাড় কাত করে মাছের মুড়ো চিবোচ্ছেন—মাছের মুড়ো পেলে তিনি আর কিছু চান না।

'আহা রে, আমি যদি একটু পেতাম!' বলে ছোটো-কালু ছোটো-জানলাটার দিকে মাথা বাড়াল। 'ইশ—কী সুন্দর একটা কেক, দেখলেও প্রাণ ঠাণ্ডা! হ্যাঁ, ভোজ হচ্ছে বটে একটা!'

কিসের একটা শব্দ শুনে ছোটো-কালু কান খাড়া করল। বড়ো রাস্তা দিয়ে কে আসছে ঘোড়ায় চড়ে—সওদাগর বাড়ি ফিরছে। সওদাগর লোকটি এমনিতে মন্দ নয়, কিন্তু ওই তার এক পাগলামি যে পুরুত জাতটাকে সে দু' চক্ষে দেখতে পারে না। তার চোখে কোনো পুরুত পড়েছে কি সে এক্কেবারে খেপে যাবে। পুরুতঠাকুর তাই

ও-বাড়িতে এমন সময়েই যান, কর্তা যখন বাড়ি থাকেন না ; আর গিন্নিঠাকরুন যত পারেন ভালো-ভালো জিনিস খাইয়ে তাঁকে খুশি করেন।

এখন হয়েছে কি, পুরুতঠাকুর সবে মাছের মুড়োটাকে গুঁড়ো করে এনেছেন, এমন সময়ে সওদাগরের ঘোড়ার শব্দ শোনা গেল। তাই তো, বড়ো মুশকিল! গিন্নি বললেন, 'আপনি চট করে ওই বড়ো সিন্দুকটার মধ্যে ঢুকে পড়ুন তো!'

কী আর করা যায়! ঢুকতেই হল পুরুতঠাকুরকে সিন্দুকটার মধ্যে, কেননা তিনি তো জানেন যে পুরুত চোখে পড়লেই সওদাগর খেপে যাবে। আর গিন্নি যত ভালো-ভালো মাছ মাংস মিষ্টি তাড়াতাড়ি উনুনটার মধ্যে লুকিয়ে ফেললেন, কেননা স্বামী এ-সব দেখলে নিশ্চয়ই জানতে চাইবেন কাকে খাওয়ানো হচ্ছিল।

ছোটো-কালু যখন দেখলে ভালো-ভালো খাবার সব সরিয়ে ফেলা হল, সে মস্ত এক দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো—'ওঃ!'

'উপরে কে?' সওদাগর জিগেস করলে। আর উপর দিকে তাকিয়ে সে ছোটো-কালুকে দেখতে পেল। 'কে তুমি ওখানে? ভালো চাও তো এসো নেমে।'

ছোটো-কালু তাড়াতাড়ি নেমে এসে বললে, 'দেখুন, আমি এই বনের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছি—এ-বাড়িতে রাতটা কাটাব ভেবেছিলুম।'

'তা বেশ তো', সওদাগর বললে। 'কিন্তু আগে কিছু খেতে হবে—কী বলো।'

সওদাগর বৌ এমন ভাব দেখালে যেন ছোটো-কালুকে দেখে সে কতই খুশি। দু' জনকে টেবিলে বসিয়ে সে তাদের সামনে রাখলে এক থালা সুজির পায়েস। সওদাগরের খিদে পেয়েছিল, ঐ সুজিই সে দিব্যি খেতে লাগল। কিন্তু ছোটো-কালু তো জানে কত সব চমৎকার মাছ-মাংস উনুনের মধ্যে লুকোনো, তার মুখে অন্য-কিছু রুচবে কেন? টেবিলের নিচে তার পায়ের কাছে ছিল সেই চামড়া-ভরা থলিটা—মনে আছে তো, ঘোড়ার চামড়া বেচতেই সে রওনা হয়েছিল। এখন সে করলে কি, থলিটাকে এমন জোরে মাড়িয়ে দিলে যে ভিতরে শুকনো চামড়াটা কড়কড় শব্দ করে উঠল।

'আরে!' সওদাগর বলে উঠল, 'কী আছে তোমার থলিটার মধ্যে?'

'ও—ও একটা জিন।'—ছোটো-কালু বললে। 'ও বলছে আমরা যেন আর সুজির পায়েস না খাই—সে জাদু করে উনুনের মধ্যে অনেক মাছ মাংস মিষ্টি এনে রেখেছে।'

'বাঃ!' সওদাগর লাফিয়ে উঠল। উনুনের ভিতর থেকে সে টেনে বার করলে কত মাছ, কত মাংস, কত মিষ্টি—যা-কিছু তার স্ত্রী লুকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু সে অবিশ্যি ভাবলে এ-সমস্ত জিনের জাদু। তার স্ত্রী কিছু বলতে সাহস পেল না—চুপ করে ও-সমস্ত খাবার তাদের সামনে এনে রাখল ; আর দু' জনে মিলে তারা খেল মাছ, খেল মাংস, খেল মিষ্টি—এমনকি সেই সুন্দর কেকটাও খেল।

খেয়েদেয়ে সওদাগরের ভারি ফুর্তি হল। সে ভাবলে ছোটো-কালুর থলির মধ্যে যে-জিন আছে, ও-রকম একজনের দেখা পেলে বেশ মজা হয়।

'ওহে', ছোটো-কালুকে একটা ঠেলা দিয়ে সে বললে, 'আমার একটা খোক্ষস দেখতে বড়ো ইচ্ছে করছে। তোমার জিন জাদু করে একটা খোক্ষস ডেকে আনতে পারে কি?'

'তা আর পারে না!' ছোটো-কালু তাড়াতাড়ি বললে। 'আমার জিনকে যা আমি বলব তা-ই সে করবে—তা-ই নয় হে?' বলে সে চামড়াটার উপর এক লাথি মারল, সঙ্গে-সঙ্গে সেইটে ক্যাঁ-ক্যাঁ করে উঠল। 'ও বলছে—নিশ্চয়ই! কিন্তু খোক্ষসটা দেখতে বড়ো বিকট—আপনি বরং ওকে না-ই বা দেখলেন।'

'ও-হো! ভয় পাবার মতো লোকই নই আমি। আচ্ছা, কী-রকম ওটা দেখতে হবে, বল তো?'

'হুবহু যেন একটি পুরুতঠাকুর।'

'ওঃ হো!' সওদাগর চেঁচিয়ে উঠল। 'বিকট! বিকট! পুরুৎদের দেখলেই আমার মাথা গরম হয়ে যায়, জানো তো! কিন্তু তাতে কী? তাতে কী? সত্যি-সত্যি তো আর পুরুত নয়, আসলে তো খোক্ষস—অনায়াসে তাকিয়ে দেখতে পারব। আমার সাহস নেই ভেবো না, কিন্তু দেখো—ওটা যেন আমার খুব কাছে এসে না পড়ে।'

'দেখি আমার জিনকে জিগেস করে', এই বলে ছোটো-কালু থলেটা পা দিয়ে চেপে ধরে মাথা নিচু করে কান বাড়িয়ে দিলে।

'কী বলছে?'

'বলছে যে ওই বড়ো সিন্দুকটার ডালা খুললেই তার মধ্যে খোক্ষস জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে দেখতে পাবেন—কিন্তু দেখবেন যেন—পিছলে পালিয়ে না-যায়।'

'তুমি আমার সঙ্গে এসে ধরবে তো?' বলে সওদাগর সিন্দুকের কাছে গেল; তার মধ্যে অবিশ্যি জ্যান্ত পুরুতঠাকুরই ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছেন। সওদাগর ডালাটা আস্তে একটুখানি তুলে নিচু হয়ে একবার উঁকি মারলো।

'উঃ!' এক ঝটকায় সে পিছনে সরে গেল। 'হ্যাঁ—সত্যিই তো, ঠিক আমি দেখেছি ওটাকে, হুবহু আমাদের পুরুতটার মতো দেখতে! উঃ কী সাংঘাতিক!'

এর পরে অবিশ্যি আর-এক প্রস্থ খাওয়া না-হলে চলে না। খেতে-খেতে গল্প করতে-করতে, অনেক রাত হয়ে গেল।

'তোমার ঐ জিনকে বেচবে আমার কাছে?' সওদাগর বললে। 'যত টাকা চাও দেব। এক ঘড়া মোহর চাও তা-ও দেব।'

ছোটো-কালু ব্যাকুলভাবে বললে, 'না, না, জিনকে বেচি কী করে? কত কাজে ও লাগে ভাবুন না!'

'দাও না, দাও না আমাকে!' অনেক কাকুতি-মিনতি করলে সওদাগর।

শেষটায় ছোটো-কালু বললে, 'আচ্ছা, আপনি এত করে বলছেন যখন—! রাত্রিটা আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, রাখলুম আপনার কথা। কিন্তু ঘড়াটা খুব ঠেসে ভরা হয় যেন।'

'তা-ই হবে, যা চাও তুমি তা-ই হবে', সওদাগর তৎক্ষণাৎ বললে। 'কিন্তু একটা কথা। ও-আপদ আমি আর বাড়িতে রাখব না। ওটা এখনো হয়তো ওখানে আছে—কে জানে!'

ছোটো-কালু সওদাগরকে দিলে তার ঘোড়ার চামড়া-ভরা থলি, আর নিলে তার বদলে এক ঘড়া মোহর, তাও ঠেসে-ঠেসে ভরা। সওদাগর তাকে দিলে মস্ত একটা ঝোলা—তার মধ্যে মোহরগুলো আর সিন্দুকটা ভরে নিতে পারবে।

'আচ্ছা, আসি তবে এখন। নমস্কার', বলে ছোটো-কালু ঝোলা কাঁধে করে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। সিন্দুকের মধ্যে তখনো পুরুতঠাকুর বসে।

বনের অন্য ধারে প্রকাণ্ড গভীর এক নদী। এমন জলের তোড় যে সেখানে সাঁতরায় কার সাধ্যি! চমৎকার একটা নতুন সাঁকো উঠেছে নদীর উপর। সাঁকোর মাঝখানে এসে ছোটো-কালু থামল, তারপর বললে—বেশ চেঁচিয়েই বললে, যাতে পুরুতঠাকুর শুনতে পায় :

'উঃ খামকা কেন এই বিদঘুটে সিন্দুকটাকে বয়ে বেড়াচ্ছি! এমনি ভারি—ভিতরে যেন পাথর ভরা! এটাকে কষ্ট করে আর টেনে নিয়ে গিয়ে লাভ কী? দিই-না এটা নদীর মধ্যে ফেলে—সাঁতরে আমার কাছে ফিরে আসে তো ভালো, আর না আসে তো—নাই-বা এল।'

বলতে-বলতে সে সিন্দুকটা দু' হাতে একটুখানি তুলে ধরল, যেন নদীর মধ্যে দেবে ফেলে।

'আরে কর কী! কর কী!' ভিতর থেকে পুরুতঠাকুর প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আমাকে আগে বেরোতে দাও!'

'ও বাবা!' ছোটো-কালু এমনভাবে চেঁচিয়ে উঠল যেন কতই-না ভয় পেয়েছে। 'এখনো ওটা আছে যে! নাঃ, এক্ষুনি এটাকে জলে ফেলে দিতে হবে—ডুবে মরুক ব্যাটা খোক্ষস!'

'না, না!' পুরুৎঠাকুর আরো জোরো চেঁচিয়ে উঠলেন। 'শুনছ—আমায় বেরোতে দাও, এক ঘড়া মোহর দেব তোমাকে!'

'তাহলে অবিশ্যি আলাদা কথা', বলে ছোটো-কালু সিন্দুকটি খুলল।

পুরুতঠাকুর হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এলেন, খালি সিন্দুকটা ঠেলে ফেলে দিলেন জলে। তারপর বাড়ি গিয়ে ছোটো-কালুর জন্য নিয়ে এলেন এক ঘড়া মোহর। সওদাগরের কাছ থেকেও এক ঘড়া সে পেয়েছিল—এখন তার সমস্তটা ঝোলা মোহরেই ভরা।

বাড়ি ফিরে এসে মেঝের উপর মোহরগুলো ভুর ভুর করে ঢালতে-ঢালতে সে ভাবলে, 'যাক, ঘোড়াটার দাম মন্দ উশুল হয় নি একরকম! বড়ো-কালু একবার যদি শোনে একটা ঘোড়া দিয়ে কত বড়লোক হয়েছি আমি, তাহলে তো তেড়ে মারতে আসবে এক্ষুনি। ওকে কিছু বলব না।'

তাই সে বড়ো-কালুর কাছে চাকর পাঠাল একটা পাল্লা চেয়ে আনতে।

'পাল্লা দিয়ে আবার কী করবে?' বড়ো-কালু একটু অবাক হয়ে ভাবলে। আর পাল্লার নিচে সে খানিকটা আলকাৎরা লেপে দিলে। ঠিক! পাল্লাটা ফেরৎ এল, তার নিচে আটকে রয়েছে তিন-তিনটে চকচকে সোনার মোহর।

'এ কী!' 'এ কী!' তক্ষুনি ছুটল বড়ো-কালু ছোটো-কালুর কাছে। 'কোথায় পেলি তুই এত টাকা?'

ছোটো-কালু উত্তরে বললে, 'ও, এ আমার ঘোড়ার চামড়া বেচে পেয়েছি।'

'ভাল দাম পেয়েছ সত্যি!' বড়ো-কালু হাঁপাতে-হাঁপাতে বাড়ি ফিরে এল; তুলে নিল কুড়োল, চার কোপে চারটে ঘোড়াকে সাবাড় করলে; তারপর তাদের ছাড়িয়ে চামড়াগুলো নিয়ে গেল শহরে বেচতে।

'চামড়া! ঘোড়ার চামড়া! কে নেবে ভালো ঘোড়ার চামড়া!' শহরে সে হেঁকে বেড়াল!

মুচিরা সব তার হাঁক শুনে দৌড়ে এল, জিগেস করলে, 'কত দাম?'

'এক-একটার জন্যে এক-এক ঘড়া মোহর,' বড়ো-কালু বললে।

'লোকটা পাগল নাকি?' সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে। 'এক ঘড়া মোহর কাকে বলে জানো হে?'

'চামড়া! ঘোড়ার চামড়া!' বড়ো-কালু আবার হাঁকতে লাগল—আর যে-ই দাম শুধোয় তাকেই বলে, 'এক ঘড়া মোহর।'

'লোকটা আমাদের বোকা বানাতে চায় নাকি?' সবাই বলাবলি করলে। তারপর মুচিরা জোট বেঁধে লম্বা পাকানো চামড়া দিয়ে তাকে এমন মারতে আরম্ভ করলে যাকে বলে—মার।

'চামড়া! ঘোড়ার চামড়া!' তারা ভেংচিয়ে বলতে লাগল।

'এই দেখে না, তোমার চামড়াকে কেমন আচ্ছা করে ট্যান করে দিয়েছি! দূর করে দাও এটাকে শহর থেকে!' আর বড়ো-কালু অবিশ্যি যত তাড়াতাড়ি পারল চম্পট দিল—এমন মার সে জীবনে কখনো খায় নি।

'তবে রে!' বাড়ি ফিরে গিয়ে সে বললে। 'শোধ তুলব, ছোটো-কালুর উপর এর শোধ তুলব আমি! ওকে খুন করব, তবে ছাড়ব!'

এদিকে হয়েছে কি, ছোটো-কালুর বুড়ি ঠানদি মারা গেছে। বুড়ি ছিল বেজায় বদমেজাজী, দিন-রাত তাকে জ্বালাতন করত—তবু সে মরে যাওয়ায় ছোটো-কালুর ভারি খারাপ লাগছিল। বুড়িকে নিয়ে সে শোয়াল নিজের বিছানায়—কে জানে

এখনো যদি বেঁচে ওঠে। সে ঠিক করে রেখেছিল বুড়ি সমস্ত রাত তার বিছানায় শোবে, আর সে নিজে ঘুমোবে ঘরের কোণে একটা চেয়ারে বসে—এ-রকম সে আগেও অনেক বার করেছে। সে তো বসে আছে চেয়ারে, এদিকে অনেক রাত্রে ঘরের দরজা খুলে গেল, ঢুকলো বড়ো-কালু কুড়ুল হাতে। ছোটো-কালুর বিছানা কোথায় সে জানত ; সোজা বিছানার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছোটো-কালু মনে করে সেই বুড়ি ঠানদির মাথায় এক ঘা দিলে বসিয়ে।

'কেমন ! আর কখনো আমাকে জব্দ করবি !' বলে বড়ো-কালু বাড়ি চলে গেল।

'লোকটা তো ভারি বদ দেখছি', ছোটো-কালু মনে মনে বললে 'ও আমায় খুন করতে চেয়েছিল। ভাগ্যিশ বুড়ি ঠানদি আগেই মরে গিছলেন—নয় তো ও তাকেই শেষ করে যেত ঠিক !'

তারপর সে করল কী, ঠানদিকে পরাল খুব ভালো পোশাক, ধার করলে একটা ঘোড়া, জুড়ল ঘোড়াটাকে একটা গাড়ির সঙ্গে, তারপর গাড়ির পিছনের দিকে ঠানদিকে শক্ত করে বাঁধল যাতে চলবার সময় হুমড়ি খেয়ে সে পড়ে না যায়। এমনি করে চলল তারা বনের ভিতর দিয়ে। সূর্য যখন উঠল, তখন তারা একটা সরাইখানার সামনে। ছোটো-কালু গাড়ি থামিয়ে ভিতরে গেল কিছু খাবে বলে।

সরাইওলার অনেক, অনেক টাকা, তাহলেও সে লোক ভালো। কিন্তু মেজাজটা তার বড্ড চড়া, যেন লঙ্কা আর তামাক দিয়ে সে তৈরি।

'এই যে', সরাইওলা বললে। 'আজ যে এত পোশাকের ঘটা ?'

'এই—একটু শহরের দিকে যাচ্ছি কিনা,' ছোটো-কালু জবাব দিলে। 'ঠানদি আছেন সঙ্গে। তাঁকে গাড়িতে বসিয়ে রেখে এসেছি—কিছুতেই নামবেন না। তা এক গ্লাস জল দিয়ে আসুন না ঠানদিকে। চেঁচিয়ে কথা বলবেন কিন্তু—বুড়ি আবার কানে খাটো।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, আমাকে কিছু বলতে হবে না,' বলে সরাইওয়ালা এক গ্লাস জল নিয়ে গেল বাইরে। গাড়িতে ঠেস দিয়ে ঠানদি ব =সে আছেন, যেন দিব্যি ভালোমানুষ।

সরাইওলা প্রথমটায় খুব মিষ্টি করেই বললে—'এই যে, আপনার জন্যে এক গ্লাস জল এনেছি।' কিন্তু বুড়ি না একটু নড়ল, না কিছু বলল। সরাইওলা তখন গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে বললে, 'শুনছেন ? এক গ্লাস জল এনেছি যে আপনার জন্যে !'

আরো একবার সরাইওলা ও-কথা বলে চেঁচাল, কিন্তু বুড়ি যেন জেদ করেছে, শুনবেই না। শেষটায় সরাইওলা গেল চটে, মারল গেলাশটা ছুঁড়ে বুড়ির মুখে। সঙ্গে সঙ্গে বুড়ি তো চিৎপটাং।

তাড়াতাড়ি ছুটে এল ছোটো-কালু।—'এ কী ! এ কী সর্বনাশ করেছ তুমি ! আমার ঠানদিকে মেরে ফেলেছ যে ! দেখো, কপালটা কতখানি গর্ত হয়ে গেছে !' বলতে-বলতে সে সরাইওলার জামাটা হাত দিয়ে ধরল চেপে।

সরাইওলা হাত কচলাতে-কচলাতে বললে, 'তাই তো! তাই তো! ভালো বিপদেই পড়া গেছে! আমার এই বিশ্রী মেজাজই আমাকে একদিন পথে বসাবে! লক্ষ্মী ভাই ছোটো-কালু, তোমাকে এক ঘড়া মোহর দিচ্ছি—নিয়ে বাড়ি চলে যাও। উনি তো আমারও ঠানদিরই মতো—সৎকার-টৎকার আমিই করব। কাউকে কিছু বলো না ভাই—তাহলে আমার মাথাটাই হয়তো কেটে ফেলবে—ভাবতেই বিশ্রী লাগে, উঃ!'

এমনি করে ছোটো-কালু আর-এক ঘড়া মোহর পেল, ঠানদির সৎকারে খরচ এক পয়সাও লাগল না। আর বাড়ি ফিরে এসেই সে চাকরকে পাঠালে বড়ো-কালুর কাছে পাল্লা চেয়ে আনতে।

বড়ো-কালুর তো চক্ষুস্থির!—'উঃ! এ আবার কী! এই না আমি ওকে মেরে এলুম! নাঃ, ব্যাপারটা নিজের চোখে দেখে আসতে হচ্ছে!' এই বলে সে নিজেই পাল্লা নিয়ে ছোটো-কালুর বাড়ি গেল।

অতগুলো মোহর দেখে বড়ো-কালু তো হাঁ! —'বল, বল শিগগির, কোথায় পেলি এত টাকা?'

ছোটো-কালু বললে, 'ভাই, তুমি আমার যা উপকার করেছ বলবার নয়। তুমি ঠানদিকে মেরে রেখে গেলে—তারপর দেখো, ঠানদিকে বেচে কত টাকা পেয়েছি!'

'সত্যি, সত্যিই তো ভালো দাম পেয়েছ', বললে বড়ো-কালু। তক্ষুনি সে ছুটল বাড়ি, তুলে নিলে কুড়ুল, এক কোপে শেষ করলে তার নিজের ঠানদিকে। তারপর ঠানদিকে একটা গাড়িতে বসিয়ে শহরে গেল এক ডাক্তারের কাছে,—জিগেস করলে, 'মড়া কিনবেন?'

'কার মড়া? তুমি কোথায় পেলে?' ডাক্তার জিগেস করলে।

'আমারই ঠানদি', বললে বড়ো-কালু। 'আমি মেরে এনেছি—এক ঘড়া মোহর পেলেই বেচি।'

'কী সর্বনাশ!' ডাক্তার আঁৎকে উঠল। 'পাগল নাকি তুমি? এমন কথা কাউকে বল না—তাহলে কাঁধে তোমার মাথা থাকবে না!' ডাক্তার বড়ো-কালুকে অনেক বুঝিয়ে বললে কাজটা তার কত খারাপ হয়েছে, ভয়ানক লোক নাহলে এ-রকম কেউ করে না—আর এর জন্যে তার ফাঁসি হওয়াই উচিত। সব শুনে বড়ো-কালুর পিলে চমকাল—এক লাফে সে উঠে বসল গাড়িতে, ঘোড়া ছুটিয়ে ভোঁ-দৌড় দিলে বাড়ির দিকে। লোকেরা তাকে পাগল মনে করে ছেড়ে দিলে।

'শোধ নেব, এর শোধ নেব!' একেবারে বড়ো-রাস্তায় পড়ে বড়ো-বড়ো নিশ্বাস ছেড়ে বড়ো-কালু বললে। 'এই তোমায় বলে রাখলাম ছোটো-কালু, এর শোধ যদি না নিয়েছি'—এই বলে সে ভয়ংকর একটা শপথ করলে।

বাড়িতে পা দিয়েই আর কথা নেই—মস্ত একটা ছালা বগলে করে সে ছোটো-কালুর কাছে গিয়ে হাজির।—'আর-একবার আমায় বোকা বানালি তুই!

সেবার মারলুম চার-চারটে জলজ্যান্ত ঘোড়া, এবার বুড়ি ঠানদিকে। বারবার চালাকি পেয়েছিস, না? জন্মের মতো তোকে ঠাণ্ডা করছি, আর—এখন কার সঙ্গে ঠকবাজি করিস দেখব!'

এই না বলে সে করলে কী, ছোটো-কালুকে ধরলে দুহাতে চেপে, তাকে ভরল একদম ছালার মধ্যে, তারপর মুখটা শক্ত করে বেঁধে ছালাটা ঘাড়ে করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

'এই চললুম তোকে নদীর মধ্যে ফেলতে!'

নদী অনেক দূরে, ছোটো-কালু এমন কিছু হালকা নয়। খানিক দূরে যেতেই পথের পাশে পড়ল এক গির্জে, ভিতরে চমৎকার অর্গান বাজছে, গান হচ্ছে। বড়ো-কালু ভাবলে, 'যাই, ভিতরে গিয়ে একটু বসি। জিরোনোও হবে, গান শোনাও হবে।' এই ভেবে সে ছালাটা নামিয়ে রাখল রাস্তার ধারে—ছোটো-কালু তো আর বেরুতে পারবে না—আর আশেপাশের লোক সব তো গির্জের মধ্যেই, কে তাকে খুলে দেবে!

বড়ো-কালু তো ভিতরে গেল, এদিকে ছোটো-কালু ছালার মধ্যে কেবলি ঘনঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে—'উঃ! উঃ!' শরীরটাকে মুচড়িয়ে দুমড়িয়ে কত রকমই সে করল, কিন্তু ছালার মুখটা একটু যদি ঢিলে হতো!

একটু পরে সে-পথ দিয়ে এল এক বুড়ো গয়লা। এত বুড়ো যে তার চুল দাড়ি সব শাদা, হাতের মোটা লাঠিটায় ভর দিয়ে সে মস্ত এক পাল গোরু-মোষ চালিয়ে নিচ্ছে। এখন হয়েছে কি, কয়েকটা গোরু ছালাটার উপর এমন হোঁচট খেল যে ছালাটা গেল উল্টিয়ে।

'ওঃ! ওঃ!' ছোটো-কালু দীর্ঘশ্বাস ফেললে, 'এই তো বয়েস আমার—এখনই কিনা আমাকে স্বর্গে যেতে হচ্ছে!'

গয়লা বলে উঠল,—'আরে আমি খুনখুনে থুত্থুরে বুড়ো,—এখন স্বর্গে উঠলেই বাঁচি।'

ভিতর থেকে চেঁচিয়ে বললে ছোটো-কালু,—'চাও স্বর্গে যেতে? তাহলে এই ছালার মুখ খুলে চটপট ভিতরে ঢুকে পড়ো—এক্কেবারে সোজা স্বর্গে গিয়ে ঠেকবে।'

'সত্যি? সত্যি?'—বুড়ো গয়লা তাড়াতাড়ি ছালার মুখ খুলে দিলে, বেরিয়ে এল ছোটো-কালু। 'তাহলে আর দেরি করো না!

বুড়ো গয়লা পলক না-ফেলতে ছালার মধ্যে ঢুকে গেল। ভিতর থেকে বললে, 'বড়ো উপকার করলে দাদা। তা আমার গোরু-মোষগুলোকে একটু দেখবে তো?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, সে-জন্য ভেবো না', বলে ছোটো-কালু ছালার মুখটা আগেকার মতো শক্ত করে বেঁধে গোরু-মোষের পাল নিয়ে রওনা হয়ে পড়ল।

একটু পরেই বড়ো-কালু গির্জে থেকে বেরিয়ে এসে ছালাটা আবার কাঁধে তুলে নিলে। আর যেন মনে হল ছালাটা আগের চাইতে একটু হালকা লাগছে—আসলে

বুড়ো গয়লা তো ছোটো-কালুর অর্ধেক! কিন্তু বড়ো-কালু ভাবলে গির্জের গান-বাজনা শুনে তার মনে ফুর্তি হয়েছে, সেইজন্যে ওজনটা অতটা টের পাচ্ছে না সে।

তবু তার মনে কেমন সন্দেহ হল। হাঁক দিয়ে বললে, 'ওহে, আছ তো ঠিক?'

বুড়ো গয়লা তাড়াতাড়ি জবাব দিলে, 'হ্যাঁ, ঠিক আছি। স্বর্গে যাচ্ছি সোজা।'

'হ্যাঁ। স্বর্গেই তো যাচ্ছ।' কথাটা শুনে বুড়ো গয়লা বড়ো আরাম পেল, এদিকে বড়ো-কালুও নিশ্চিন্ত হয়ে আবার পথ ধরল।

মস্ত নদী—যেমন চওড়া তেমনি গভীর। বড়ো-কালু পাড়ে দাঁড়িয়ে হেঁইয়ো করে ছালাটা জলের মধ্যে ফেলে দিলে—বুড়ো গয়লাকে সুদ্ধু ; তারপর ছোট-কালুকে বললে, 'কেমন এবার! আর চালাকি করবি আমার সঙ্গে!'

বাড়ি ফেরবার পথে একটা চৌরাস্তায় এসে বড়ো-কালু দেখে, ছোটো-কালু অন্য দিক থেকে আসছে একপাল গোরু-মোষ চালিয়ে।

'এ কী! এই না তোমাকে জলে ডুবিয়ে এলাম!'

'এই তো এইমাত্র জল থেকে উঠে এলাম। আর বল না ভাই, যা উপকার করেছ!'

'এ-সব গোরু-মোষ কোত্থেকে জোটালে?'

'এ-সব জলের জন্তু। ভাগ্যিশ আমাকে ডুবিয়েছিলে ভাই, তাই তো আমি এক লাফে গাছের উপরে চড়ে বসলুম। অ্যাদ্দিনে সত্যি আমি বড়লোক হলুম!'

ছোটো-কালু বললে, 'তাহলে সমস্তটাই শোনো। কী ভয়ই আমি পেয়েছিলুম—ছালার মধ্যে কুঁকড়ি-মুকড়ি হয়ে পড়ে! আর তুমি যখন আমাকে হেঁইয়ো করে ছুঁড়ে ফেললে—বাস-রে সে কী বাতাসের শিষ! টুপ করে তো ডুবে গেলুম জলের নিচে, কিন্তু বলব কী তোমায়, একটুও চোট লাগল না আমার—নদীর নিচে সে কী চমৎকার নরম ঘাস! তার উপর যেই না পড়া, অমনি ছালার মুখ খুলে গেল, আর অপরূপ এক কন্যা এসে দাঁড়াল আমার পাশে। ফুলের মতো শাদা তার পোশাক, ভিজে চুলে তার সবুজ কুঁড়ির মালা। সে আমার হাত ধরে বললে, "ভাই ছোটো-কালু, সত্যি কি তুমি এসেছ? এখন এই গোরু-মোষগুলোই নাও—এই রাস্তা দিয়ে মাইলখানেক গেলে আরো অনেক দেখতে পাবে—সবই তোমার।" তখন আমি বুঝতে পারলুম যে নদীটা আসলে একটা রাস্তা—নদীর তলা দিয়ে জল-জন্তুরা সমুদ্র থেকে আসে, সোজা ডাঙা পর্যন্ত হেঁটে যায়। সেখানে কী সুন্দর সব ফুল আর লতা-পাতা, সে তোমায় কী বলব! মাছগুলো ঠিক আমার কানের কাছ দিয়ে সাঁতরে চলে গেল, আকাশে যেন পাখি উড়ছে। আর কী সুন্দর মানুষ সেখানকার—আর কী সুন্দর সব গোরু-মোষ সেই নরম ঘাসে মনের সুখে চরে বেড়াচ্ছে!'

'তাহলে আবার উঠে এলে কেন?' বড়ো-কালু জিগেস করলে, 'আমি হলে তো অত সুন্দর জায়গা থেকে আর নড়তুম না!'

ছোটো-কালু বললে, 'আহা, এটা বুঝলে না? এই তো বুদ্ধির প্যাঁচ! জলকন্যা আমাকে বললে তো—মাইলখানেক গেলে আরো অনেক গোরু-মোষ পাবে। এখন সেই নদীতে জানো তো—কত মোড়, কত প্যাঁচ, কত আঁকাবাঁকা—অনেক ঘুরে যেতে হয়। সেইজন্যে আমি ভাবলুম, অত ঘুরে গিয়েই যদি এক মাইল, ডাঙা দিয়ে গেলে আধ মাইলের বেশি হতে পারে না। তাই আমি চলেছি—ঐ মাঠটা পার হয়ে আবার নদীতে গিয়ে নামব—সেখানকার জলজন্তু সব তো আমার।'

'ভাগ্য বটে তোমার!' বড়ো-কালু বলে উঠল। 'আচ্ছা, আমি যদি জলের নিচে যাই, আমি কি কিছু জলজন্তু পাব না?'

'তা পেতে পারো; কিন্তু আমি তোমায় ছালায় ভরে বয়ে নিতে পারব না—তুমি যে বড্ড ভারি! তবে তুমি যদি নদীর ধারে গিয়ে ছালার মধ্যে ঢুকে পড়ো, তাহলে অবিশ্যি তোমাকে জলের মধ্যে ফেলে দিতে আমার আপত্তি নেই।'

'বেশ ভাই, বেশ', বড়ো-কালু খুশি 'য়ে বললে—'কিন্তু যদি সেখানে কোনো জলজন্তু না পাই তাহলে উঠে এসে তোমাকে কিন্তু এমন মারব—'

'না ভাই, খুব বেশি মেরো না,'—ছোটো-কালু বললে।

দুজনে একসঙ্গে গেল নদীর ধারে। অনেকক্ষণ ধরে চলতে-চলতে গোরু-মোষগুলোর তেষ্টা পেয়েছিল—জল দেখেই তারা ছুটে নদীতে গিয়ে নামল।

'দেখো, দেখো!' ছোটো-কালু বললে। 'নদীতে ফিরতে পারলে এরা বাঁচে!'

বড়ো-কালু ধমক দিয়ে বললে, 'কই, আগে আমাকে ফেল! নয় তো এমন মারব—'

একটা মোষের পিঠে মস্ত একটা ছালা বিছোনো ছিল, সেটা নিয়ে এসে ছোটো-কালু বললে, 'এই যে, ঢুকে পড়।'

তক্ষুনি ঢুকল বড়ো-কালু ছালার মধ্যে, ঢুকে বললে, 'একটা পাথর দিয়ে দাও—এমনিতে হয়তো ডুবব না—কে জানে!'

'নিশ্চয়ই', বলে ছোটো-কালু খুব ভারি একটা পাথর ছালার মধ্যে দিয়ে মুখটা শক্ত করে বাঁধল, তারপর দিলে গায়ের জোরে এক ধাক্কা। ঝুপ! বড়ো-কালু গড়িয়ে পড়ল নদীতে, সঙ্গে সঙ্গে ডুবে গেল একেবারে তলায়।

ছোটো-কালু বললে—'ও জলজন্তুদের খুঁজে পেলে হয়!' তারপর নিজের গোরু-মোষের পাল নিয়ে রওনা হল বাড়ির দিকে।

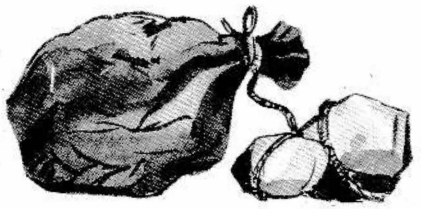

এক খোঁয়ায় পাঁচজন

এক ছিল মটরশুঁটি।

এক মানে অবিশ্যি এক জন নয়, কারণ আসলে তারা ছিল পাঁচ জন। এক হচ্ছে খোসাটা, আর পাঁচ হচ্ছে ভিতরের মটরশুঁটি। খোসাটা সবুজ, তারাও সবুজ, তাই তারা ভাবত সমস্ত পৃথিবীটাই বুঝি সবুজ—ভাবতেই পারত! খোসাটা বাড়ল, তারাও বাড়ল—ফুটফুটে পাঁচজন এক সারে পাশাপাশি বসে। বাইরে রোদের আলো, খোসাটা তাতে গরম হয় ; বাইরে বৃষ্টির জল, খোসাটা তাতে পরিষ্কার পাতলা হয়ে আসে। ফুটফুটে দিনেও ভালো, থমথমে রাতেও ভালো ; দিনে-দিনে পাঁচ জন তারা বড়ো হয়—আর যত বড়ো হয় ততই তাদের ভাবনা ধরে—কিছু করতে হবে তো!

'এখানেই চিরকাল বসে থাকব নাকি আমরা?' একজন বললে। 'বসে থাকতে-থাকতে শক্ত হয়ে গেলেই গেছি! বাইরে কত জানি কী হচ্ছে—একটু-একটু টের পাচ্ছি যেন।'

মাস কেটে গেল। হলদে হয়ে এল তারা, হলদে হয়ে এল খোসা।

'সমস্ত পৃথিবী হলদে হয়ে যাচ্ছে', তারা বললে। বলতেই পারে। হঠাৎ খোসায় এক টান। খোসাটা কে ছিঁড়ে নিলে, কার হাতের ভিতর দিয়ে চলে গেল, টুপ করে পড়ল একটা জামার পকেটে, সেখানে আরো অনেক খোসায় ঠেলাঠেলি ভিড়।

'এখন আমাদের খুলবে!' খুব ফুর্তি হল তাদের মনে—এতদিন তো এরই জন্যে তারা বসে ছিল!

পাঁচ জনের মধ্যে সবচেয়ে ছোটো যে, সে বললে, 'দেখা যাক আমাদের মধ্যে সবচেয়ে দূরে কে যায়।' যিনি সবচেয়ে বড়ো, তিনি শুধু বললেন, 'যা হবার তা-ই হবে।'

ঠাস! ফাটল খোসা, পাঁচজনে গড়িয়ে বেরিয়ে এল ঝকমকে রোদে। ছোট্ট নরম একটি হাতে তারা শুয়ে। ছোট্ট একটি ছেলে হাতের মুঠোয় তাদের ধরে আছে।

'বাঃ!' ছেলেটি বলে উঠল। 'এগুলো দিয়ে আমার ধনুকের চমৎকার গুলি হবে।' এই না বলে একজনকে সে ধনুকের ছিলার উপর রাখল, কানে-কানে টেনে দিলে ছুঁড়ে।

'চললুম আমি এই মস্ত পৃথিবীতে উড়ে! দেখো আমাকে ধরতে পারো কিনা!' বলে সে চলে গেল।

আর এক জন বললে, 'আমি এক্কেবারে ঠিক সূর্যের বুকের মধ্যে গিয়ে লাগব। ঠিক আমার মনের মতো জায়গা—বলে সে মিলিয়ে গেল।

'যেখানেই গিয়ে আমরা পড়ি না, খুব এক চোট ঘুমিয়ে নেব। তারপর গড়াব মনের সুখে', বললে এর পরেই দু জন। গড়াল বটে তারা, পেট ভরে গড়িয়ে নিলে

ছিলাতে লাগাবার আগেই ; কিন্তু ছেলেটি তাদের তুলে নিয়ে আবার ছুঁড়ে মারলে। যেতে-যেতে তারা বললে, 'আমরা যাব সবচেয়ে দূরে।'

'যা হবার তা-ই হবে', বললে শেষের জন। ধনুক থেকে বেরিয়ে সে ছুটল, ছুটে গিয়ে লাগল একটা কুঁড়েঘরের জানলার কপাটে।

এখন হয়েছে কী, সেই কপাটে ছিল একটা ফুটো, আর সেই ফুটো নরম কাদা আর ঘাস দিয়ে আটকানো। এত জোরে ছুটে এসে সে একেবারে আটকে গেল সেখানটায়—না-পারে নড়তে, না-পারে চড়তে। তবুও সে মোটেও ঘাবড়ালে না, মনে মনে বললে,—'যা হবার তা-ই হবে।'

ঘরের ভিতরে থাকে এক কাঠকুড়ুনি, বড়ো গরিব সে। বনে-বনে ঘুরে-ঘুরে সে কাঠ কুড়োয়, শুকনো পাতা কুড়োয় ; লোকের বাড়ি-বাড়ি ঘুরে বাসন মাজে, ইঁদারা থেকে জল তোলে। শরীরে তার যথেষ্ট শক্তি, কাজে তার ক্লান্তি নেই, তবু তার দুঃখ দূর হয় না। ঘরে আছে তার ছোট্ট মেয়ে, অসুখে ভুগে-ভুগে তার মরণ-দশা। পুরো এক বছর সে আছে বিছানায় শুয়ে—তারপর এমন হয়েছে যেন সে বাঁচবেও না, মরবেও না।

কাঠকুড়ুনি মনে-মনে ভাবে, 'ও বুঝি চলল ওর ছোটো বোনটিরই কাছে। দু'টি মাত্র মেয়ে ছিল আমার—তাদের খাওয়ানো পরানো কম কষ্ট নয়। কিন্তু ঈশ্বর নিজেই এক জনের ব্যবস্থা করলেন, টেনে নিলেন তাঁর কোলে। আর-এক জনকে আমি তো চাই আমার কাছেই রাখতে, কিন্তু ওরা দু বোন বুঝি আর আলাদা থাকবে না।'

কিন্তু কই, মরল না তো মেয়ে!

সমস্ত দিন চুপ করে সে বিছানায় শুয়ে থাকে—আর তার মা ঘোরে বাইরে-বাইরে, কাঠ কুড়োয়, পাতা কুড়োয়, জল তোলে, বাসন মাজে। তখন বসন্তকাল, ভোরবেলায় তার মা যখন কাজে বেরিয়ে যায়, রোদের সোনালি রেখা জানলা দিয়ে মেঝেতে এসে পড়ে—মেয়েটি জানলার দিকে চুপ করে তাকিয়ে থাকে।

'জানলার কপাটে ঐ ছোট্ট সবুজ ওটা কী, মা? হাওয়ায় নড়ছে?'

মা জানলার ধারে এগিয়ে দেখলে। 'আরে তাই তো! ছোট্ট একটা মটরশুঁটি যে, এখানেই শিকড় গজিয়েছে, পাতাও গজিয়েছে দু-একটা! এই ফাটলের মধ্যে কী করে ও এল? এই তো তোমার ছোট্ট বাগান, খুকুমণি, বসে-বসে তাকিয়ে দেখো।'

বলে মা খুকুর বিছানা জানলার আরো কাছে টেনে আনলে। মা কাজে বেরিয়ে যায়, আর খুকু শুয়ে-শুয়ে দ্যাখে মটরশুঁটিটা কেমন সুন্দর বেড়ে উঠছে আস্তে-আস্তে।

একদিন সন্ধেবেলায় খুকু বললে, 'মা, আমার মনে হচ্ছে আমি ভালো হয়ে উঠবো। আজকের রোদটা বড়ো সুন্দর লাগল। আর দেখছ ঐ মটরশুঁটির কাণ্ড—কী

চমৎকার বাড়ছে। আমিও অমনি হব, মা, আমিও ভালো হয়ে উঠব, বাইরে বেড়াব এই সুন্দর রোদ্দুরে।'

'তা-ই যেন হয়, বাছা, তা-ই যেন হয়!'

মা ও-কথা বললে বটে, কিন্তু মনে মনে সে জানে যে খুকু তার বাঁচবে না। তবু সে কপাটের সঙ্গে একটা কাঠি বেঁধে দিলে—বাড়ন্ত সবুজ ডগাটুকু বেয়ে উঠতে পারবে। ও যেন হাওয়ার দাপটে ছিঁড়ে না পড়ে—ওকে দেখেই তো খুকু ভাবতে শিখেছে সে বাঁচবে।

কী আশ্চর্য! ছোট্ট সবুজ সেই ডগাটুকু সত্যি-সত্যি কাঠি বেয়ে উঠল, উঠল উপরে, ঠেলে উঠল নতুন প্রাণের আনন্দে, রোজ সে একটু-একটু করে বাড়ছে।

'আরে, ফুলও ফুটেছে যে একটা', কাঠকুড়ুনি হঠাৎ একদিন বলে উঠল। তখন থেকে তার মনে আশা হল যে খুকু সত্যি-সত্যি হয় তো ভালো হয়ে উঠবে। ক'দিন থেকে খুকু বেশ ভালোই আছে তো। দিব্যি কথাবার্তা বলে, আগের চেয়ে অনেক বেশি হাসিখুশি। কাল একবার উঠেও বসেছিল, বসে-বসে তার ছোট্ট বাগানের দিকে তাকিয়ে দেখেছে, সে-বাগানে একটিমাত্র ছোট্ট চারাগাছ।

কয়েক দিন পরেই খুকু দস্তুরমতো এক ঘণ্টা উঠে বসে রইল। বড়ো ভালো লাগল তার রোদে পিঠ দিয়ে ব'সে থাকতে। জানলায় ফুটেছে বেগনি রঙের মটরশুঁটি ফুল। খুকু মুখ বাড়িয়ে কচি-কচি নরম পাতাগুলোকে একবার চুমু খেল। দিনটি লাগল উৎসবের মতো।

মা আর খুশি চাপতে না-পেরে বলে উঠল, 'স্বর্গের দেবতাই এই মটরশুঁটিকে পাঠিয়েছেন আমার ঘরে, তিনিই ফুটিয়েছেন এই ফুল। তুই খুশি হবি বলে—আর তোর খুশিতে আমিও খুশি হবো', বলে সে হাসল বেগুনি রঙের ফুলের দিকে তাকিয়ে, যেন সে-ফুল স্বর্গের কোনো দেবদূত।

কিন্তু আর চারজন? তাদের খবর কী! শোনো তবে। যে মস্ত পৃথিবীতে উড়ে চ'লে গিয়ে বলেছিল, 'দেখো, আমাকে ধরতে পারো কিনা', সে গিয়ে পড়ল এক বাড়ির ছাদে, সেখানে পায়রাদের দানা শুকোতে দেয়া হয়েছিল, পড়বি তো পড় তারই মধ্যে। তারপর—খুট! খুট! আর তারপর পায়রার পেটে। যে-দু' জন কুড়েমি করে ঘুমোতে চেয়েছিল তাদেরও পায়রা খেয়ে ফেললে—তবু যা-হোক একটা কাজে লাগল। কিন্তু তার পরের জন, যে চেয়েছিল সূর্যে গিয়ে লাগতে—সে পড়ল একটা নর্দমায়ঃ এক মাস, দু' মাস, তিন মাস শুয়ে রইল সেই নোংরা জলে—আর বেজায় ফুলতে লাগল।

'কী সুন্দর মোটা হচ্ছি আমি!' মনে-মনে সে বললে। 'শেষটায় এক দিন ফেটেই যাব—কিন্তু মটরশুঁটির পক্ষে তো এই ফেটে যাওয়াই সবচেয়ে বড়ো গৌরব। পাঁচ জনের মধ্যে আমি হচ্ছি শ্রেষ্ঠ।'

নর্দমা বললে,—'ঠিক কথা।'

এদিকে কুঁড়ে ঘরের জানলায় ছোট মেয়েটি দাঁড়িয়ে, চোখে তার আলো, গালে তার স্বাস্থ্যের লাল আভা। পাতলা দু' হাত দিয়ে মটরশুঁটি ফুলকে আদর করছে সে।

'দেবতার অনেক দয়া, তুই ফুটেছিলি', বললে সে মেয়েটি।

'শ্রেষ্ঠ মটরশুঁটি, তুমি যে আমারই!' নর্দমা বললে।

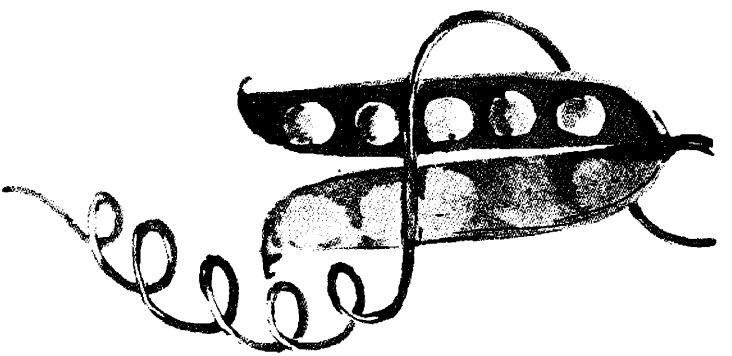

রাজকন্যা ও মটরশুটি

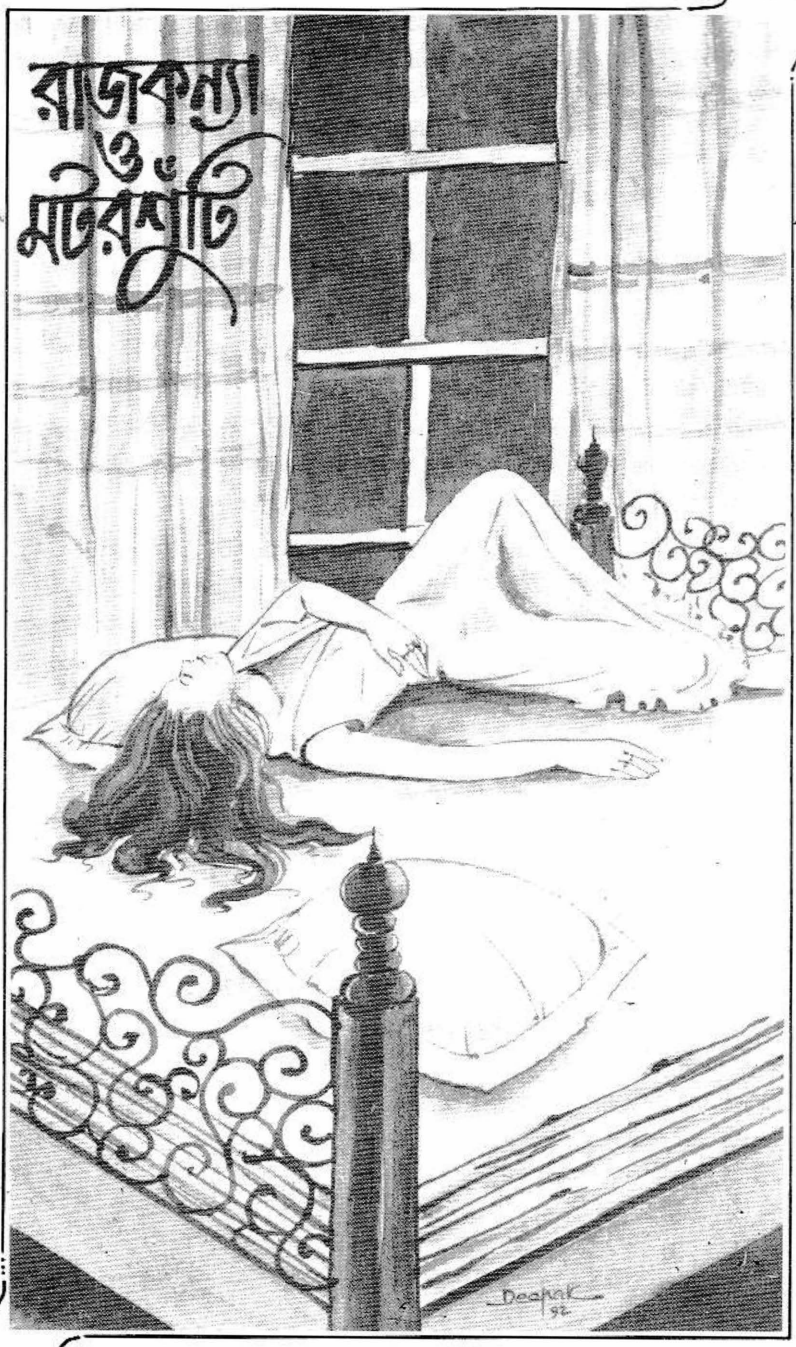

এক ছিল রাজপুত্র। তার ইচ্ছে এক রাজকন্যাকে বিয়ে করে, কিন্তু সত্যিকার রাজকন্যা হওয়া চাই। তাই সে বেরিয়ে পড়ল ভ্রমণে, খুঁজে বেড়াল সারা পৃথিবী, কিন্তু কোথাও সত্যিকার রাজকন্যা পাওয়া গেল না। যেখানেই যায়, কিছু-না-কিছু গলদ ধরা পড়ে। রাজকন্যে তো কতই আছেন, কিন্তু সত্যি তাঁরা রাজকন্যা কি না তা ঠাহর করা অসম্ভব হল—মনে হয় যেন একটা কোনো খুঁত আছেই, সব সময়। বেচারা রাজপুত্র তাই দেশে ফিরে এল—বড্ড মন খারাপ তার, তার যে চাই সত্যিকার এক রাজকন্যা!

সন্ধেবেলা সেদিন ভীষণ ঝড় এল। বজ্র, বিদ্যুৎ, মুষলধারে বৃষ্টি—একেবারে সাংঘাতিক ব্যাপার। এরই মধ্যে সিংহদরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হল ; বুড়ো রাজা গিয়ে দোর খুলে দিলেন।

বাইরে দাঁড়িয়ে আছে এক রাজকন্যা। কিন্তু—রামো! রামো!—বৃষ্টিতে আর দারুণ ঝড়ে কী চেহারাই-না হয়েছে তার! জল গড়িয়ে পড়ছে তার চুল থেকে, জামা-কাপড় থেকে, জুতোর ডগার মধ্য দিয়ে ঢুকে গোড়ালি দিয়ে বেরিয়ে আসছে—আর তবু মেয়েটা বলে কিনা সে সত্যিকার রাজকন্যা।

রানী-মা ভাবলেন, 'আচ্ছা, সে দেখা যাবে।' কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। শোবার ঘরে গিয়ে খাটের তোশক চাদর সব তুলে ফেললেন, খাটের তক্তার উপর রাখলেন একটি মটরশুঁটি। সেই মটরশুঁটির উপর পাতা হল কুড়িটা জাজিম, আবার জাজিমগুলোর উপর আরো কুড়িটা হাঁসের পালকের তোশক। এই বিছানাতেই রাজকন্যাকে রাত কাটাতে হল।

সকালবেলা তাকে জিগেস করা হল রাত্রে কেমন ঘুমিয়েছিল সে।

'কেমন? বিশ্রী! খুব খারাপ!' জবাব দিলে রাজকন্যা 'সারারাত চোখের দু-পাতা এক করতে পারি নি! বিছানার মধ্যে কী ছিল কে জানে—কিন্তু পিঠে এত শক্ত লাগছিল যে মনে হয় আমার হাড়মাস কালি হ'য়ে গেছে। কী বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড!'

তখন সবাই বুঝল যে ইনিই সত্যিকার রাজকন্যা, নয়তো কুড়িটা জাজিম আর কুড়িটা পালকের তোশকের মধ্য দিয়ে একটি মটরশুঁটি টের পাওয়া তো সম্ভব নয়! সত্যিকার রাজকন্যা ছাড়া এমন নরম চামড়া আর কার হবে?

এবারে রাজপুত্রকে মানতে হল সত্যিকার রাজন্যাকে খুঁজে পাওয়া গেছে, তাকে বিয়ে করলেন তিনি, আর সেই মটরটিকে রাখা হল জাদুঘরে—সেখানেই সেটি আছে এখনো—যদি-না কেউ সরিয়ে নিয়ে থাকে।

কেমন—গল্পটা কিন্তু সত্যি!

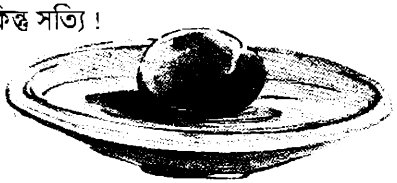

ছোট্ট জলকন্যা

মস্ত বড়ো সমুদ্রের মধ্যে অনেক, অনেক দূরে জল যেখানে অপরাজিতার মতো নীল আর স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ, যেখানটা এতই গভীর যে হাজারটি উঁচু-চূড়া মন্দির পর-পর সাজালে তবে উপর থেকে একেবারে তলায় গিয়ে ঠেকে—সেখানে সাগর রাজার দেশ।

তোমরা বুঝি ভেবেছিলে জলের নিচে বালি ছাড়া কিছু নেই? তা নয়, মোটে তা নয়। আশ্চর্য সুন্দর সেখানকার গাছপালা, এত হালকা তার ডালপালা যে জল একটু কেঁপে উঠল কি তারা নেচে উঠল শিরশিরিয়ে—হঠাৎ দেখলে তাদের জীবন্তই মনে হয়। ডালের ফাঁক দিয়ে-দিয়ে কতো রকমের ছোটো-বড়ো মাছ ছুটোছুটি করে বেড়ায়—ঠিক যেমন আমাদের গাছে-গাছে ওড়ে পাখির ঝাঁক।

জল যেখানে সবচেয়ে গভীর সেখানে সাগর-রাজার প্রাসাদ। দেয়ালগুলো তার একালের, উঁচু জানলাগুলো পান্না-বসানো, আর শঙ্খের কাজ-করা ঢেউ-খেলানো ছাদ ঢেউয়ের দোলায়-দোলায় এই খুলছে, এই বুজছে। কী যে সুন্দর হয় দেখতে, প্রতিটি শঙ্খের বুকে ঝকঝকে উজ্জ্বল একটি মুক্তো, তার যে-কোনো একটি পেলে উপরকার দেশের যে-কোনো রাজা ধন্য হয়ে যায়।

সাগর-রাজার স্ত্রী মারা গেছেন অনেক দিন, তাঁর বুড়ি-মা ঘরসংসার দেখেন। এই বুড়ির বুদ্ধিসুদ্ধি নেহাৎ মন্দ নয়, কিন্তু সাগরসমাজে তাঁরাই যে সবচেয়ে বড়ো ঘর, এ নিয়ে বেজায় দেমাক তাঁর। তাঁর ল্যাজে কিনা বারোটা ঝিনুক বসানো, সেটাই বড়ো ঘরের মার্কা, অন্যদের বড়ো জোর ছ'টা। এ ছাড়া তাঁর আর সবই ভালো, সবার মুখেই তাঁর সুখ্যাতি। রাজার ছয় মেয়ে, ছ'টি ফুটফুটে ছোট্ট রাজকন্যা। বুড়ি তাঁর নাতনীদের প্রাণের চেয়েও ভালোবাসেন। সবাই সুন্দর তারা, সবচেয়ে সুন্দর একেবারে ছোট্টটি। তার গায়ের রং গোলাপের পাপড়ির মতো তেমন নরম, সমুদ্রের মতো নীল তার চোখ ; অবিশ্যি অন্য সব জলকন্যার মতো তারও পা নেই, পায়ের দিকটায় মাছের মতো লম্বা ল্যাজ—তা কী কোমল আর কত উজ্জ্বল !

সমস্ত দিন মেয়েরা প্রাসাদের বড়ো-বড়ো ঘরে খেলা করে ; সেখানে চারদিকের দেয়ালে ফোটে নানারঙের নানারকমের সুন্দর ফুল। পান্নার জানলাগুলো একটু খুলেছ কি মাছেরা সাঁতরে এল ঘরে, যেমন আমাদের জানলা দিয়ে চড়ুইপাখি উড়ে আসে। কিন্তু মাছেদের সাহস চড়ুইপাখির চেয়ে অনেক বেশি, তারা সোজা রাজকন্যার কাছে এসে গা ঘেঁষে খেলা করে, খায় তাদের হাত থেকে, আদর করলে আর যেতেই চায় না, গায়ের সঙ্গে লেগে ঘুরে বেড়ায়।

প্রাসাদের সামনে মস্ত বাগান ভরে গাছের সারি, কোনোটা আগুনের মতো লাল, কোনোটা মেঘের মতো ঘন-নীল, গাছের ফল সোনালি রঙে ঝলোমলো, জ্বলন্ত সূর্যের মতো উজ্জ্বল গাছের ফুল। আমাদের বাগান হয় মাটিতে ; ওখানের বাগান বালিতে, উজ্জ্বল নীল রঙের বালি, গন্ধক-জ্বলা আগুনের মতো নীল। সমস্তটার

উপরে অদ্ভুত সুন্দর একটা নীল রঙের ছোপ ; সেখানে গেলে মনে হবে যেন অনেক উঁচুতে উঠে গেছি, আকাশ মাথার উপরে, আকাশ পায়ের নিচে ; সমুদ্রের তলায় যে আছি তা মনেই হবে না। জল যখন শান্ত, তখন সূর্য তাকিয়ে থাকে যেন বেগুনি রঙের একটা প্রকাণ্ড ফুল, তার ভরা পিয়ালা থেকে পৃথিবীর সমস্ত আলো যেন উপচে পড়ছে।

বাগানের এক-এক অংশ এক-এক রাজকন্যার দখলে ; সেখানে তারা যার যা খুশি করে। এক জন তার বাগান সাজিয়েছে তিমির চেহারা করে ; আর-এক জনেরটা ঠিক জলকন্যার মতো ; কিন্তু সবচেয়ে ছোট কন্যার যেটা, সেটা একেবারে সূর্যের মতো গোল ; আর সূর্যটা তার চোখে কিনা লাল দেখাত—সেইজন্যে তার ফুলগুলোও সব টকটকে লাল রঙের। এই মেয়েটি কিছু অদ্ভুত গোছের, ভারি চুপচাপ, একা বসে-বসে কী যেন ভাবে। হয়তো একদিন উপরে এক জাহাজ ডুবেছে : তার নানারকম-রংচংয়ে সুন্দর জিনিস নিয়ে মেতেছে তার বোনেরা, কিন্তু শিশু-কোলে-করা শ্বেতপাথরের একটি বালক-মূর্তি ছাড়া আর-কিছু এই মেয়ে চায় না। মূর্তিটি নিয়ে সে তার বাগানে রাখল, রোপণ করল তার পাশে একটি লাল ফুলের গাছ। গাছটি তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠল, তার লম্বা ডাল নুয়ে পড়ল মাটির উপর—সেখানে চির-চঞ্চল বেগুনি রঙের ছায়ায় যেন ডালে-মূলে জড়াজড়ি।

এই জলকন্যা সবচেয়ে ভালোবাসত মানুষদের কথা শুনতে, সমুদ্রের উপরে যাদের দেশ। ঠানদিকে খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে সব গল্প শুনতো সে—জাহাজের আর মানুষের আর ডাঙার প্রাণীর যত গল্প তিনি জানতেন, সব। ওখানকার ফুলে নাকি গন্ধ আছে—কী ভালো লাগতো তার এ-কথা শুনে, তাদের সমুদ্রের ফুলগুলো সব তো গন্ধহীন—ওখানকার বনের রং সবুজ, আর তার ডালপালায় মাছ যত ছুটে-ছুটে বেড়ায় সব নানা রঙের,আর কী মিষ্টি গলায় গান করে তারা! ঠানদির মনে ছিল অবিশ্যি পাখিদের কথা, কিন্তু বলবার সময় মাছই বলেছিলেন : নাতনীরা-তো আর কখনো পাখি দেখে নি, বললে কি কিছুই বুঝত তারা?

গল্প শেষ করে ঠানদি বলতেন,—'তোমাদের যখন পনেরো বছর বয়েস হবে তখন তোমরা উঠতে পারবে সমুদ্রের উপরে ; পাহাড়ের ফাঁকে বসে থাকবে চাঁদের আলোয়, দেখবে জাহাজ যাচ্ছে, বুঝবে কাকে বলে শহর, আর কাকে বলে মানুষ।'

পরের বছর সবচেয়ে বড়োটির পনেরো হল। আর আর বোনেরা—আহা বেচারারা! মেজোটি বড়োটির এক বছরের ছোটো, সেজোটি মেজোর ছোট এক বছরের, এমনি করে-করে সবচেয়ে ছোটটির কপালে আরো পাঁচ-পাঁচ বছর বসে থাকা! তখন আসবে সেই শুভদিন—সে-ও উঠতে পারবে সমুদ্রের উপরে, দেখতে পারবে উপরকার পৃথিবীর সব কাণ্ড। যা-ই হোক বড়োটির যখন যাবার সময় হল সে কথা দিলে, ফিরে এসে বোনদের কাছে সব গল্প বলবে ; বুড়ো ঠানদি বিশেষ কিছু বলতেই পারেন না, আর তারা যে কত জানতে চায় তার তো অন্তই নেই।

কিন্তু ছেলেবয়েসের এই বাধা থেকে ছাড়া পাবার আগ্রহ সবচেয়ে ছোটটির মতো আর কারুরই তেমন তীব্র নয়। সবচেয়ে বেশি দেরি তারই—আর চুপচাপ একা বসে কী ভাবে সে? কত রাত খোলা জানলা দিয়ে স্বচ্ছ নীল জলের দিকে সে তাকিয়ে রয়েছে, চারদিকে মাছেরা ছুটোছুটি করে খেলা করছে, দেখেছে সে সূর্য আর চাঁদ, ম্লান তাদের আলো ; উপরে কেমন দেখায়—তার চেয়ে হয়তো অনেকটা বড়ো, অনেকটা উজ্জ্বল। যদি হঠাৎ কালো ছায়া পড়েছে—একটা তিমি বুঝি, নাকি মানুষে বোঝাই একটা জাহাজ ভেসে চলে গেল। সে-সব মানুষ স্বপ্নেও ভাবলে না যে তাদের অনেক, অনেক নিচে ছোটো এক জলকন্যা জাহাজের হালের দিক ব্যাকুল আগ্রহে দিয়েছে লম্বা হাত দুটো বাড়িয়ে।

তারপর সেই দিন এল। বড়ো মেয়েটির বয়েস হল পনেরো, উঠল সে সমুদ্রের ওপরে।

ওঃ, ফিরে এসে তার হাজার গল্প। সবচেয়ে ভালো লেগেছে তার চাঁদের আলোয় বালির উপর বসে মস্ত শহরটার দিকে তাকিয়ে থাকতে, সেখানে তারার মতো ঝিলিমিলি কত আলো আর কত গানবাজনা। দূর থেকে সে শুনেছে মানুষের আর গাড়ির শব্দ, দেখেছে মন্দিরের উঁচু চূড়ো, শুনেছে ঘণ্টার শব্দ ; আর ওখানে যেতে পারবে না বলেও ও-সব জিনিসের জন্যে তার আরো বেশি মন-কেমন করছে।

এ-সব গল্প শুনতে-শুনতে ছোটোটির নিঃশ্বাস পড়ে না। এর পর রাত্রে তার খোলা জানলায় যখন সে দাঁড়ায়, জলের ভিতর দিয়ে উপরে তাকিয়ে সে সেই বিরাট শব্দময় শহরের কথা ভাবতে-ভাবতে এমন তন্ময় হয়ে যায় যে তার মনে হয় সে বুঝি মন্দিরে ঘণ্টার শব্দ শুনতে পাচ্ছে।

পরের বছর দ্বিতীয় বোনটি পেল ছাড়া। সে যখন ভেসে উঠল সমুদ্রের উপর সূর্য তখন অস্ত যায়-যায় ; আর তা দেখে এত ভালো লাগল তার যে সে ফিরে এসে বললে, জলের উপরে যা কিছু তার চোখে পড়েছে, এত সুন্দর আর কিছুই নয়।

'সমস্ত আকাশ একেবারে সোনায় সোনা' সে ফিরে এসে বললে। 'আর মেঘগুলো কী যে সুন্দর তা আমি বলে দেখাতে পারব না—এই লাল, এই বেগুনি, এই কাজল-কালো, ভেসে মিলিয়ে গেল আমার মাথার উপর দিয়ে। কিন্তু আরো তাড়াতাড়ি উড়ে এল জলের উপর দিয়ে এক ঝাঁক শাদা রাজহাঁস, ঠিক যেখানে সূর্য নেমে এসেছে। আমি তাকিয়ে রইলুম তাদের দিকে, সূর্য অস্ত গেল ; সমুদ্রের ঢেউয়ে-ঢেউয়ে আর মেঘের ধারে-ধারে যে-গোলাপী আভা, তা-ও গেল আস্তে-আস্তে মিলিয়ে।

তৃতীয় বোনের উপরে যাবার সময় হল। সবচেয়ে বেশি সাহস তারই, সে চলল এক নদীর স্রোত ধরে-ধরে। নদীর দু' ধারে ছোটো ছোটো সবুজ পাহাড় ; সেখানে গাছপালা, সেখানে আঙুর-খেত, ফাঁকে-ফাঁকে ঘর, বাড়ি, প্রাসাদ। সে শুনল পাখির

গান ; আর সূর্যের তাপে তার মুখ প্রায় পুড়ে গেল, থেকে-থেকে তাই তাকে জলে ডুব দিয়ে নিতে হল। এক জায়গায় একদল ছেলে-মেয়ে লাফালাফি করে স্নান করছে ; তার খুব ইচ্ছে হল ওদের সঙ্গে গিয়ে খেলে, কিন্তু ওরা ছুটে পালাল বিষম ভয় পেয়ে, আর ছোটো কালো একটা জানোয়ার তাকে দেখে এমন ঘেউ-ঘেউ করতে লাগল যে অগত্যা সে-ও ভয় পেয়ে ফিরে এল সমুদ্রে। তবু সে ভুলতে পারে না সেই সবুজ বন, আর নীলায়িত পাহাড় ; আর ফুটফুটে ছেলে-মেয়েগুলোই বা কী, পাখনা নেই, তবু কেমন নির্ভয়ে নদীতে সাঁতরে বেড়ায় !

চতুর্থ বোনটির অত সাহস হল না, সে খোলা সমুদ্রেই রইল ; ফিরে এসে বললে, অত সুন্দর আর কিছুই হতে পারে না। শাদা-পাল-তোলা জাহাজ দূর দিয়ে ভেসে গেছে,—এত দূরে যে মনে হয়েছে যেন এক ঝাঁক গাংচিল ; জলে খেলা করছে ফুর্তিবাজ শুশুকের দল ; বিরাট তিমি এক নিশ্বাসে হাজারটা ফোয়ারা তুলে দিয়েছে আকাশে।

পরের বছর পঞ্চম বোনটির পনেরো বছর হল। তার জন্মদিন পড়ল শীতকালে ; সমুদ্রের তখন সবুজ রং, প্রকাণ্ড সব বরফের পাহাড় জলে ভাসছে। সে বললে সেগুলো মুক্তোর মতো শাদা দেখতে—অবিশ্যি মানুষের দেশের মন্দিরগুলোর চেয়ে ঢের বেশি বড়ো। এরই এক পাহাড়ের চুড়োয় বসে সে বাতাসে তার চুল দিলে খুলে, জাহাজগুলো তাড়াতাড়ি পাল তুলে দিয়ে যত শিগ্‌গির পারল ছুটে পালাল।

সন্ধেবেলায় সমস্তটা আকাশ পালে-পালে ভরে গেল ; বরফের বিরাট পাহাড়গুলো এই উঠছে, এই ডুবছে, নীল-লালচে একটা আভায় উঠেছে ঝিকঝিকিয়ে ; আর মেঘ চিরে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল, গুম্‌গুম্ করে বাজের আওয়াজ চলল গড়িয়ে। তক্ষুনি নামানো হল সব জাহাজের পাল, সবাই সেখানে ভয়ে জড়োসড়ো ; শুধু রাজকন্যা চুপচাপ বসে আঁকাবাঁকা বিদ্যুতের দিকে শান্তচোখে তাকিয়ে রইল।

এরা সকলেই প্রথমবার উঠে নানা রকম নতুন সুন্দর জিনিস দেখে গেল মুগ্ধ হয়ে, কিন্তু সে নতুনের মোহ শিগ্‌গিরই কেটে গেল। কিছু দিনের মধ্যেই উপরের পৃথিবীর চাইতে নিজের বাড়িই তাদের ভালো লাগতে আরম্ভ করল—আর কোথাও কি সবকিছু এমন মনের মতো পাওয়া যায় ?

প্রায়ই সন্ধেবেলায় পাঁচ বোন হাতে হাত রেখে গভীর জল থেকে উঠে আসত অপরূপ তাদের কণ্ঠস্বর, অমন কোনো মানুষের হয় না। ঝড়ের আগে আগে জাহাজের সামনে দিয়ে তারা যেত সাঁতরে—গান গাইত কী মধুর, কী অপরূপ মধুর সুরে ! সে-গান যেন বলত,—জলের নিচে আমাদের কী যে আনন্দ তা কি দেখবে না ওগো নাবিক, ভয় করো না ; এসো, নিচে নেমে এসো আমাদের কাছে।

নাবিকরা অবিশ্যি সে-কথা বুঝতে পারত না ; তারা ভাবত এ শব্দ বুঝি শুধু জলের শিস, এমনি করে তারা সমুদ্রের লুকানো ঐশ্বর্য ছাড়িয়ে আসত ; কেননা জাহাজ ডুবলে সবাই তো মরবে, আর মৃত মানুষ ছাড়া সাগর-রাজের প্রাসাদে কেউ কখনো ঢোকে নি।

পাঁচ বোন যখন সন্ধেবেলায় সাঁতরে বেড়াচ্ছে, ছোটোটি বসে আছে তার বাপের প্রাসাদে, একা স্তব্ধ হয়ে মুখ উঁচু করে তাকিয়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে তার, কিন্তু জলকন্যারা তো কাঁদতে পারে না ; সেইজন্যে, তাদের যখন মন খারাপ হয়, মানুষের মেয়েদের চাইতে কত বেশি যে কষ্ট পায় তারা, তার অন্ত নেই।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে ভাবে,—'কবে হবে আমার পনেরো বছর! আমি ঠিক জানি, উপরের পৃথিবী আর সেখানকার মানুষদের খুবই ভালো লাগবে আমার।'

শেষ পর্যন্ত এত আশার সেই সময় এল।

ঠানদি বললেন,—'নে, এবার তোর পালা। আয় তোকে তোর বোনেদের মতো করে সাজিয়ে দিই', বলে তিনি তার চুলে জড়ালেন শাদা শাপলার মালা, আধখানা মুক্তো দিয়ে তৈরী তার এক-একটা পাপড়ি ; তারপর আটটা বড়ো-বড়ো ঝিনুককে হুকুম করলেন তার ল্যাজের সঙ্গে লাগতে—তাতে বোঝা যাবে সে কত বড়ো ঘরের মেয়ে।

'বড়ো অসুবিধে লাগে এতে', ছোট্ট রাজকন্যা আপত্তি করলে।

'সুন্দর দেখাতে হলে এক-আধটু অসুবিধে গায়ে না মাখলে চলে না ভাই', ঠানদি হেসে বললেন।

এত জাঁক-জমক কিন্তু রাজকন্যার বড়ো পছন্দ হল না ; মাথার ভারি মুকুটটা বদলে তার বাগানের লাল ফুল পরতে পারলে সে খুশি হত, তাতে তাকে মানাতও ঢের ভালো। কিন্তু সে সাহস পেল না ; ঠানদির কাছে বিদায় নিয়ে সমুদ্রের উপর ভেসে উঠল সে, ফেনার মতো হালকা।

যখন জলের উপর জীবনে প্রথম সে দেখা দিলে, সূর্য ঠিক দিগন্তে নেমে গেছে। মেঘেরা জ্বলছে লাল-সোনালি আলোয়, সন্ধ্যাতারা ফুটেছে পশ্চিমের আকাশে, ঝিরঝিরে হাওয়া বইছে, আর সমুদ্রটা মস্ত একটা আয়নার মতো নিশ্চল পড়ে। তিনটে মাস্তুলওলা এক জাহাজ ঠাণ্ডা জলের উপর চুপ করে শুয়ে ; একটি পাল শুধু তুলে দেয়া, সেটাও কিন্তু নড়ছে না, হাওয়ার বেশি জোর নেই। নাবিকেরা সিঁড়িতে চুপচাপ বসে। ডেক থেকে আসছে গান-বাজনার শব্দ। তারপর অন্ধকার হল, হঠাৎ একসঙ্গে হাজার আলো জ্বলে উঠল, জাহাজে উড়ল অগুনতি নিশেন।

ছোটো জলকন্যা কাপ্তেনের ঘরের কাছে গেল সাঁতরে। জাহাজটা জলের দোলানির সঙ্গে সঙ্গে আস্তে ওঠা-নামা করছে, এক বার সে উঁকি মেরে কাচের জানলা দিয়ে তাকাল। ভিতরে অনেক জমকালো পোশাক-পরা মানুষ ; তাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর এক রাজপুত্র। খুব অল্প বয়েস তার, বড়ো জোর ষোলো ;

বড়ো–বড়ো কালো তার চোখ। তারই জন্মদিনের উৎসব আজ। নাবিকেরা ডেকের উপর নাচছে, আর রাজপুত্র তাদের সামনে বেরিয়ে আসতেই একশো হাউই আকাশে লাফিয়ে উঠল, রাত হয়ে গেল দিন। জলকন্যা তাতে এতই ভয় পেলে যে খানিকক্ষণ সে চুপ করে রইল জলে ডুবে।

আবার যখন সে তার ছোটো মাথাটি তুলল, তার মনে হল যেন আকাশের সব তারা তার গায়ের উপর ঝরে পড়ছে। এমন অগ্নিবর্ষণ সে আর কখনো দেখে নি ; সে কখনো শোনেও নি এমন আশ্চর্য ক্ষমতা মানুষের আছে। তাকে ঘিরে ঘুরছে যেন বড়ো বড়ো সূর্য, বাতাসে সাঁতরে বেড়াচ্ছে জ্বলজ্বলে মাছ, আর সমুদ্রের শান্ত জলে পড়ছে তার পরিষ্কার ছায়া। জাহাজে এত আলো যে স্পষ্ট সব দেখা যায়। কী সুখী এই রাজপুত্র, কী সুখী ! সে নাবিকদের অভিনন্দন গ্রহণ করল, একটু হাসি–ঠাট্টা করল তাদের সঙ্গে, এদিকে গানের মধুর সুরগুলো রাত্রির নীরবতায় গেল মিলিয়ে।

রাত বাড়ল ; কিন্তু এই জাহাজ আর এই সুন্দর রাজপুত্রকে ছেড়ে সে যেন কিছুতেই নড়তে পারছে না। ঢেউয়ের দোলা–লাগা কেবিনের ফুটো দিয়ে সে তাকিয়েই রইল। নিচে জল ফেনিয়ে উঠছে, জাহাজ বুঝি ছাড়ল। ওই তো তুলে দিয়েছে পাল, উঁচু হয়ে উঠছে ঢেউ, মোটা–মোটা মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল, দূর থেকে শোনা গেল বাজের আওয়াজ।

নাবিকেরা যেই দেখতে পেলে ঝড় আসছে, অমনি তারা আবার পাল দিলে নামিয়ে। ঝড়ের সমুদ্রে মস্ত জাহাজটা হালকা এতটুকু নৌকোর মতো দুলছিল ; ঢেউগুলো অসম্ভব উঁচু হয়ে জাহাজের উপর দিয়ে গেল গড়িয়ে—এক বার সে নিচে ডুবে যায়, এক বার সে মাথা তুলে ওঠে।

এ–সব ব্যাপারে জলকন্যার অবিশ্যি খুবই মজা লাগল, কিন্তু নাবিকদের সবাই একেবারে ভয়ে জড়োসড়ো। জাহাজ গেল ফেটে, মোটা মাস্তুলগুলো ঢেউয়ের দাপটে পড়ল নুয়ে, জোরে জল ঢুকতে লাগল। জাহাজ একটুখানি এদিক–ওদিক দুলল, তারপর বড়ো মাস্তুলটা বাঁশের কঞ্চির মতো গেল ভেঙে ; জাহাজ উল্টিয়ে গিয়ে জলে ভরে উঠল। জলকন্যা এতক্ষণে নাবিকদের বিপদ বুঝতে পারল ; কেননা ভাঙা জাহাজের মোটা–মোটা কাঠ ঢেউয়ে–ঢেউয়ে ভেসে পাছে তার গায়েই লাগে, সেজন্যে তাকে সাবধানও হতে হল।

কিন্তু ঠিক তখনই একেবারে ঘুটঘুট্টি অন্ধকার হয়ে এল, চোখে আর কিছু দেখা যায় না। একটু পরেই ভয়ংকর এক বিদ্যুতের চমকে সে সমস্তটা ভাঙা জাহাজ দেখতে পেল। জাহাজ যেন তলিয়ে গেল জলের নিচে—তার চোখ খুঁজল রাজপুত্রকে। প্রথমটা সে খুশিই হল ; ভাবলে, এখন তো সে আমার বাড়িতেই আসবে। কিন্তু একটু পরেই তার মনে পড়ল যে জলের নিচে তো মানুষ বাঁচে না ;

কাজে কাজেই রাজপুত্র যদি-বা কখনো তার প্রাসাদে ঢোকে, ঢুকবে মৃত মানুষ হয়েই।

'না না, রাজপুত্র মরবে না, মরবে না!' নিজের বিপদের কথা ভুলে ভাঙাচোরা টুকরোর ভিতর দিয়ে সে সাঁতরে গেল, শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেল রাজপুত্রকে। সে একেবারে তখন অবসন্ন হয়ে পড়েছে, অতি কষ্টে জলের উপর রেখেছে মাথা তুলে। হাত-পা ছেড়ে দিয়ে সে চোখ বুজে ছিল—নিশ্চয়ই ডুবে মরত যদি না ঠিক সেই মুহূর্তে জলকন্যা এসে তাকে বাঁচাত। সে তাকে দু' হাতে জলের উপর তুলে ধরল, স্রোতে ভেসে চলল দুজনে।

সকালের দিকে ঝড় ঠাণ্ডা হল, কিন্তু জাহাজটার কোনো চিহ্নই পাওয়া গেল না। সমুদ্রের ভিতর থেকে সূর্য উঠল আগুনের মতো, তার আলোয় রাজপুত্রের গালের আভা ফিরে এল যেন। কিন্তু চোখ তার তখনো বোজা। রাজকন্যা তার উঁচু কপালে চুমু খেল, ভিজে চুল সরিয়ে দিল মুখ থেকে। সে যেন তার বাগানের শ্বেত পাথরের মূর্তির মতোই দেখতে। সে আর-এক বার চুমু খেয়ে মনে মনে প্রার্থনা করলে রাজপুত্র শিগগির যেন ভালো হয়ে ওঠে।

তারপর সে দেখতে পেল শুকনো ডাঙা, পাহাড়গুলো বরফে চিকচিক করছে। পাড়ের ধার দিয়ে-দিয়ে চলেছে সবুজ বন, আর বনে ঢোকবার মুখে একটা মঠ কি মন্দির—কী যে ঠিক বোঝা গেল না। ঢোকবার পথটির দু' ধারে সারি-সারি খেজুর, পাশের বাগানে লেবুগাছের ভিড়। এখানে ছোটো একটি উপসাগর, জল গভীর হলেও খুব শান্ত, পাহাড়ের নিচে শুকনো শক্ত বালি। এখানে ভেসে এসে লাগল জলকন্যা। মরো-মরো রাজপুত্রকে নিয়ে, মাথা উঁচু করে তাকে শোয়াল গরম বালুতে, সূর্যের দিকে ফেরাল তার মুখ।

মন্দিরে ঘণ্টা বাজল ঢং ঢং করে, এক দল মেয়ে বাগানে বেরিয়ে এল বেড়াতে। জলকন্যা তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে কতগুলো পাথরের পিছনে লুকোলো, ফেনায় ঢাকল মাথা, তাতে তার ছোট মুখটি কেউ আর দেখতেই পেলে না। কিন্তু আড়ালে থেকে সে চোখ রাখল রাজপুত্রেরই উপর।

একটু পরেই একজন মেয়ে এগিয়ে এল। রাজপুত্রকে দেখে সে যেন ভয় পেয়েই গেল, সে মনে করলে ও মরে গেছে। নিজেকে সামলে নিয়ে সে ছুটে গিয়ে তার বোনদের ডেকে আনলে। জলকন্যা দেখলে, রাজপুত্র তাজা হয়ে উঠেছে, মেয়েরা সব তার মুখের উপর মুখ নিচু করে হাসছে। কিন্তু রাজপুত্র চোখ মেলে অবিশ্যি তাকে খুঁজল না, সে তো আর জানে না কে তাকে বাঁচিয়েছে! আর তাকে যখন মন্দিরের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হল, এত খারাপ লাগল জলকন্যার মন যে তৎক্ষণাৎ ঝুপ করে জলে ডুব দিয়ে ফিরে গেল তার বাপের প্রাসাদে।

ফিরে এসে সে যেন আগের চেয়েও বেশি শান্ত, বেশি চুপ-চাপ হয়ে গেল। বোনেরা জিগেস করলে সে উপরের পৃথিবীতে কী-কী দেখে এল, কোনো জবাব দিলে না সে।

যেখানে রাজপুত্রকে রেখে এসেছিল সেখানে কত সন্ধ্যায় সে গিয়ে উঠত। সে দেখত পাহাড়ের বরফ গলছে, বাগানে পেকে উঠছে ফল ; কিন্তু রাজপুত্রকে কখনো দেখত না, ফিরে যেত ম্লান মুখে সমুদ্রের তলায়। বাগানে বসে-বসে রাজপুত্রের মতো সেই পাথরের মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকা হয়ে উঠল তার একমাত্র আনন্দ। ফুলগুলোর জন্যে তার আর মমতা নেই ; বিপুল প্রচুরতায় বেড়ে উঠে তারা সিঁড়িগুলো ছেয়ে ফেলল, তাদের লম্বা-লম্বা লতাগুলো গাছের ডালে ডালে এমন করে জড়িয়ে ফেললে যে সমস্ত বাগান যেন একটি কুঞ্জবন হয়ে গেল।

তারপর আর সে তার মনের দুঃখ চেপে রাখতে পারলে না। বললে গোপন কথাটা এক বোনকে, সে বললে অন্য বোনেদের, তারা বললে তাদের কোনো-কোনো বন্ধুকে। তাদের মধ্যে এক জলকন্যা রাজপুত্রের কথা শুনেই বুঝতে পারলে,—জাহাজের উৎসব সে দেখেছিল নিজের চোখে ; রাজপুত্র কোন্ দেশের, কে সেখানকার রাজা, সব জানা ছিল তার।

'আয় বোন', বলে জলকন্যারা তাকে জড়িয়ে ধরল। একসঙ্গে হাতে হাত ধরে তারা ভেসে উঠল ঠিক সেই রাজপুত্রের প্রাসাদের সামনে।

ঝকমকে হলদে পাথরের প্রাসাদ, শ্বেতপাথরের উঁচু সিঁড়ির ধাপ সোজা সমুদ্র থেকে উঠে গেছে। মাথায় সোনার গম্বুজ ; বিরাট থামগুলোর ফাঁকে-ফাঁকে শ্বেতপাথরের মূর্তিগুলো হঠাৎ দেখলে সত্যিকারের মানুষ বলেই মনে হয়। উঁচু জানলাগুলোর পরিষ্কার কাচের ভিতর দিয়ে দেখা যায় মখমলের পরদা-ঝোলানো শিলার ঘর, দেয়ালে জমকালো ছবি। সাগর-রাজার মেয়েদের পক্ষে এমন অপরূপ দৃশ্য দেখা মস্ত একটা ফুর্তির ব্যাপার ; সবচেয়ে বড়ো একটা ঘরের জানলা দিয়ে তাকিয়ে তারা দেখল মাঝখানে এক ফোয়ারা খেলছে, তার জল উঠছে ছিটিয়ে উপরের ঝকমকে গম্বুজ পর্যন্ত ; ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো ঝিলকিয়ে পড়ে নাচছে জলে, চিকচিক করছে চারদিকের সুন্দর গাছপালা।

এখন জলকন্যা জানল কোথায় থাকে তার প্রিয় রাজপুত্র ; এখন থেকে প্রায় রোজ সন্ধ্যায় সে সেখানে যায়। সাহস করে বাড়ির যতটা কাছাকাছি সে যায়, অতটা যায় না আর-কোনো বোন ; শ্বেতপাথরের বারান্দার তলা দিয়ে যে-ছোটো খাল গেছে, এক দিন সে তা দিয়েও সাঁতরে গেল খানিকটা। এখানে, উজ্জ্বল জোছনার রাত্রে বসে-বসে সে রাজপুত্রকে দেখে, রাজপুত্র তো তাকে দেখতে পায় না, সে জানে নিজে সে একা-একা আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

কখনো রাজপুত্র বেড়াতে বেরোয় রং-করা শৌখিন নৌকোয়, উপরে ওড়ে নানা রঙের নিশেন। জলকন্যা লুকিয়ে থাকে পাড়ের সবুজ বাঁশ-বনে, কান পেতে শোনে

তার কথা ; তার রুপোলি ঘোমটা মাঝে মাঝে হালকা হাওয়ায় উড়ে যায়, তার খসখসানি নৌকোর কেউ যদি শোনে, মনে করে বুঝি একটা হাঁসের ডানা-ঝাপটানি কেঁপে গেল।

কোনো-কোনো রাত্রে জেলেরা মশালের আলোয় মাছ ধরে ; রাজপুত্রের কথাই বলাবলি করে তারা, কত তার মহৎ কীর্তি। সে-সব কথা শুনতে-শুনতে জলকন্যার মন সুখে ভরে ওঠে ; ঢেউয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে সে-ই তো তাকে বাঁচিয়েছিল, আর সে শুয়েছিল তার হাতের উপর অবশ মাথা রেখে—কিন্তু সে তো তা জানে না, কিছুই জানে না, স্বপ্নেও ভাবতে পারে না।

সব মানুষ জলকন্যার ক্রমেই প্রিয় হয়ে উঠতে লাগল। আহা, সে যদি মানুষ হত! কত বড়ো মানুষের পৃথিবী, সমুদ্রের উপর দিয়ে জাহাজে করে তারা উড়ে যায়, মেঘ-মাড়ানো পাহাড়ের চূড়ায় বেয়ে ওঠে ; আহা, তাদের বন-জঙ্গল ধূ-ধূ কত দূর চলে গেছে, অত দূর জলকন্যার চোখ যায় না।

অনেক জিনিসের মানে সে বুঝতে চায়, কিন্তু তার বোনেরা ভালো করে জবাব দিতে পারে না। যেতে হল আবার তাকে বুড়ি ঠানদির কাছে—তিনি তো 'সমুদ্রের উপরের দেশের' অনেক খবর রাখেন।

'যে-সব মানুষ ডুবে মরে না তারা কি চিরকাল বাঁচে? আমরা যারা সমুদ্রের তলায় থাকি—আমাদের মতো তারাও কি মরে না?'

ঠানদি উত্তর দিলেন—'মরে বইকি। আমাদের মতো মরতে হবে তাদেরও, তাদের জীবন আমাদের চাইতে অনেক ছোটো। আমরা বাঁচি তিন শো বছর, তারপর মরে সমুদ্রের ফেনা হয়ে ভেসে বেড়াই। অমর আত্মা নেই আমাদের, নেই পুনর্জন্ম ; এক বার কেটে ফেলা ঘাসের মতো আমরাও চিরকালের মতো যাই শুকিয়ে। কিন্তু মানুষের বেলায় শরীর ধুলো হয়ে গেলেও আত্মা থাকে বেঁচে ; আমরা যেমন মানুষের বাড়ি-ঘর দেখবার জন্যে জল থেকে উঠি, তারা ওঠে উপর-আকাশের অজানা অপরূপ রাজ্যের দিকে, যাকে বলে তারা স্বর্গ—আমরা তা দেখতে পারি নে।'

'আমাদের আত্মা নেই কেন?' ছোট্ট জলকন্যা জিজ্ঞেস করলে। 'আমি তো অনায়াসে তিন শো বছরের আয়ু ছেড়ে দিতে পারি, যদি এক দিনের জন্যেও মানুষ হয়ে বাঁচতে পাই, যদি পাই স্বর্গের সেই বাড়ির খোঁজ!'

ঠানদি বললেন,—'এ-সব কথা ভুলেও মনে আনিস না। ঢের ভালো আছি আমরাই ; কত বেশি দিন বাঁচি, কত সুখে থাকি!'

'একদিন তো মরতেই হবে ; তারপর সমুদ্র আমাকে ফেনার মতো অবিশ্রান্ত আছড়াবে, চুরমার করে ভেঙে উড়িয়ে দেবে হাওয়ায়, আর কখনো মাথা তুলে শুনব না সমুদ্রের গান, কখনো দেখব না সুন্দর ফুলগুলো আর এই উজ্জ্বল সূর্য। আচ্ছা ঠানদি, অমর আত্মা কি পাওয়া যায় না কিছুতেই?'

'পাগল! এ অবিশ্যি সত্যি কথা যে যদি কোনো মানুষ তোকে এত ভালোবাসে যে তার বাপ-মার চেয়েও তুই প্রিয় হয়ে উঠিস, যদি সে সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোকেই চায়, আর বিবাহের মন্ত্র পড়ে, শপথ করে বলে যে চিরকাল তোকেই ভালোবাসবে সে, তাহলে অবিশ্যি তার আত্মা উড়ে আসবে তোর মধ্যে, মানুষের সার্থকতা তুই জানবি। কিন্তু তা কি কখনো হতে পারে? আমাদের চোখে আমাদের শরীরের সবচেয়ে সুন্দর অংশ যেটা, সেই ল্যাজটাই তো তাদের চোখে পরম কুৎসিত, তারা ওটাকে মোটেই সহ্য করতে পারে না। শরীরের সঙ্গে দুটো বিদঘুটে খুঁটি না-থাকলে নাকি ওদের চোখে সুন্দর দেখায় না—যাকে ওরা বলে পা।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে জলকন্যা নিজেই শরীরের দিকে তাকাল : এমন সুন্দর, এমন নরম—কিন্তু এ তো একটা আঁশওয়ালা ল্যাজ!

ঠানদি বললেন, 'সুখী তো আমরাই! তিন শো বছর আমরা হেসে-খেলে, লাফিয়ে-সাঁতরে বেড়াব—সেটা অনেক কাল—তারপর মরব নিশ্চিন্ত হয়ে। আজ রাত্রে সভায় একটা নাচ আছে যে।'

রানী-মা যে-নাচের কথা বললেন, অমন জমকালো ব্যাপার পৃথিবীতে অবিশ্যি কখনো দেখা যায় নি। সভার দেয়ালগুলো সব স্ফটিকের, যেমন পুরু তেমনি স্বচ্ছ। তাদের গায়ে সারে-সারে হাজার-হাজার শঙ্খ বসানো, কোনোটার গোলাপি রং, ঘাসের মতো সবুজ কোনোটা ; কিন্তু সবগুলোরই ভিতর থেকে তীব্র আলো বেরিয়ে আসছে, তাতে সমস্তটা ঘর আলোয় আলোময়। স্বচ্ছ দেয়াল ছাড়িয়ে তাদের আলো জলেও অনেক দূর গিয়ে পড়েছে ; তাতে ঝলমল করে উঠছে লাখ-লাখ মাছের আঁশ—কোনোটা লাল, কোনোটা বেগুনি, কোনোটা সোনালি কি রুপোলি, একটা ছোটো, একটা-বা বড়ো।

সভার মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে স্বচ্ছ উজ্জ্বল একটা স্রোত, তারই উপর নাচছে দলে-দলে জলপুরুষ আর জলকন্যা, তাদেরই নিজেদের অপরূপ কণ্ঠস্বরের তালে-তালে ; অমন মধুর নাচের ভঙ্গি পৃথিবীতে কখনো দেখা যায় নি। তারি মধ্যে ছোট্ট রাজকন্যাটির গলায় যেন সুরের ফোয়ারা, তেমন তো আর-কারো নয়! হাত-তালি দিয়ে তাকে ধন্যবাদ জানালে সবাই।

এতে সে খুশিই হল। সমুদ্রে কি পৃথিবীতে তার চেয়ে অপরূপ স্বর কোনোখানেই নেই, এ সে ভালো করেই জানে। একটু পরেই সে উপরকার পৃথিবীর কথাই ভাবতে লাগল ; সুন্দর রাজপুত্রকে ভুলতে পারে না সে, তার যে অমর আত্মা নেই এ-দুঃখ সামলাতে পারে না সে। পিতার প্রাসাদ থেকে পালিয়ে এল সে ; ভিতরে যখন বয়ে চলেছে উৎসবের স্রোত, তার ছোট্ট উপেক্ষিত বাগানে গিয়ে বসে রইল সে চুপ করে।

হঠাৎ সে শুনলে শিঙার ফুঁয়ের শব্দ জলের উপর দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে দূর-দূরান্তরে মিলিয়ে গেল। মনে মনে বললে সে, 'এই বুঝি সে বেরুলো শিকারে—যাকে আমি বাপ-মার চেয়েও বেশি ভালোবাসি, সব সময় ভাবি যার কথা, যার

মধ্যে আমার জীবনের সব আনন্দ জমে রয়েছে। সব, সব বিপদ আমি নেব—তাকে যদি পাই, আর পাই সেই সঙ্গে অমর আত্মা। আমার বোনেরা নাচুক রাজসভায় ; আমি যাব সেই ডাইনির কাছেই—চিরকাল তাকে নিদারুণ ভয় করেই এসেছি—কিন্তু এখন সে ছাড়া আমার তো উপায় নেই আর !'

গেল সে বাগান ছেড়ে। ফেনিয়ে-ওঠা যে ঘূর্ণি ছাড়িয়ে ডাইনির বাসা, গিয়ে দাঁড়াল তার ধারে। এ-পথে সে আগে কখনো আসে নি। এ-পথে ফোটে না ফুল, সাগর-ঘাস মাড়াতে হয় না। পার হয়ে আসতে হল ধূ-ধূ ধূসর বালিরাশি, তারপর ঘূর্ণি। তার জল রেলগাড়ির চাকার মতো ফোঁসফোঁস করে ঘুরছে—যা-কিছু কাছে পায়, টেনে ছিঁড়ে নিয়ে যায় অতল পাতালে। এই ভীষণ জায়গা দিয়েই যেতে হল তাকে। ডাইনির দেশে যাবার আর পথ নেই যে। তারপর পার হতে হল একটা ডোবা। লিকলিকে পিছল কাদাগুলো টগবগ করে ফুটছে। ডাইনি এটাকে নাকি বলে তার খেলার মাঠ। এরপরে একটা বনের মধ্যে তার বাসা—বাসাখানাও অদ্ভুত।

চারদিকে যত গাছ আর ঝোপঝাড় সব ফণিমনসার জাত : যেন লক্ষমুণ্ড এক-একটা সাপ ফণা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ; ডালগুলো ঠিক লম্বা লিকলিকে হাতের মতো, আঙুলগুলো জ্যান্ত পোকা। মূল থেকে মাথা পর্যন্ত প্রতি অঙ্গ সমস্ত দিকে অবিশ্রান্ত নড়ছে, বাড়িয়ে দিচ্ছে নিজেকে। যা-কিছু তারা ধরে, এমন করেই আঁকড়ে ধরে যে জন্মেও সে সব আর ছাড়ানো যায় না।

এই ভীষণ বনের দিকে তাকিয়ে ছোট্ট জলকন্যা চুপ করে একটু দাঁড়িয়ে রইল। ভয়ে টিপটিপ করতে লাগল তার বুক। নিশ্চয়ই সে তখনই ফিরে যেত, যদি না তার মনে পড়ত রাজপুত্রের কথা আর অমরতা! কথাটা ভেবে তার সাহস বেশ বেড়ে গেল। সে বেঁধে নিলে তার লম্বা চুল, যাতে ফণিমনসায় আটকে না যায়। বুকের উপর হাত দুটি চেপে ধরে মাছের মতো দ্রুতবেগে জলের ভিতর দিয়ে শোঁ করে চলে গেল সে ; পার হয়ে এল বিদঘুটে গাছগুলো, খামকাই তারা পিছনে ব্যগ্র হাত বাড়ালে।

এটা অবিশ্যি সে লক্ষ না করে পারলে না যে প্রত্যেকটি গাছের মুঠোর মধ্যে কিছু-না-কিছু আঁকড়ে ধরা, হাজার ছোটো ছোটো হাত লোহার বেড়ির মতো শক্ত হয়ে চেপে বসেছে। সমুদ্রে ডুবে মরে কত মানুষ এই পাতালে তলিয়ে গেছে ; তাদের শাদা-শাদা কঙ্কাল এই ফণিমনসার মুঠোর মধ্যে থেকে বিকট দাঁত বার করে হাসছে। তারা জড়িয়ে রয়েছে ডাঙার জন্তুদের কত-কত মুণ্ডু, বুকের পাঁজর, আর আস্ত কঙ্কাল। নানা জিনিসের মধ্যে একটি জলকন্যাও দেখা গেল ; তাকে তারা আঁকড়ে ধরে গলা টিপে মেরেছে। কী ভীষণ দৃশ্য বেচারা ছোট্ট রাজকন্যার চোখের সামনে !

যাই হোক, এই আতঙ্কের বনের ভিতর দিয়ে সে নির্বিঘ্নে তো পার হল। তারপর পিছল কাদা-ভরা একটা জায়গা, মস্ত মোটা মোটা শামুকেরা সেখানে সুড়সুড়

করে বেড়াচ্ছে, আর তারই মাঝখানে ডাইনির বাড়ি—যত দুর্ভাগা জাহাজ ডুবে মরেছে, তাদের হাড় দিয়ে তৈরী। এখানে বসে ডাইনি কুচ্ছিৎ একটা কোলাব্যাঙকে আদর করছিল, আমরা যেমন পোষা পাখিকে আদর করি। বিকট মোটা মোটা শামুকগুলোকে সে পায়রা বলে ডাকে—তারা তার সারা গায়ে অনায়াসে হাত-পা ছড়িয়ে বেড়ায়।

ডাইনি বললে,—'কী চাও তুমি আমার কাছে তা আমি জানি। তুমি আস্ত একটা বোকা, কিন্তু তুমি যা চাও তা-ই হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভয়ানক বিপদে পড়বে তুমি—ওগো ফুটফুটে রাজকন্যা, এ তোমাকে আগেই বলে দিচ্ছি। ল্যাজটা তোমার পছন্দ হচ্ছে না—এই তো? চাও তুমি তার বদলে মানুষের মতো দুটো ঠ্যাং—এই তো? তাহলে রাজপুত্র তোমাকে ভালোবাসবেন, তুমি পাবে অমর আত্মা। তা-ই নয় কি?'

এ-কথা বলে ডাইনি এত চেঁচিয়ে উঠল যে তার পোষা শামুক-ব্যাঙগুলো চমকে লাফিয়ে তার সারা গা থেকে পড়ল ঝরে।

'ঠিক সময়ে তুমি এসেছ', ডাইনি বলতে লাগল। 'যদি সূর্যাস্তের পরে আসতে তাহলে আর এক বছরের মধ্যেও তোমার জন্যে কিছু করবার সাধ্যি থাকত না আমার। তোমাকে দেব খানিকটা মন্ত্র-পড়া জল, তা নিয়ে তুমি সাঁতরে ডাঙায় যাবে, তীরে বসে সেটা খাবে। অমনি তোমার ল্যাজ খসে পড়বে, গজিয়ে উঠবে লম্বা দুটো কাঠি, মানুষের অতি আদরের পা। কিন্তু মনে রেখো—ভীষণ লাগবে, ভীষণ কষ্ট পাবে ; মনে হবে তোমার শরীরের ভিতর দিয়ে কেউ ধারালো একটা ছুরি চালিয়ে নিয়ে গেল। এই রূপান্তরের পর যে যে দেখবে তোমাকে, সে-ই বলে উঠবে তুমি পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী কন্যা ; থাকবে তোমার ভঙ্গির লাবণ্য, এত হালকা পা কোনো নর্তকীর নয় ; কিন্তু প্রতিবার পা ফেলতে তোমার অসহ্য যন্ত্রণা হবে—হাঁটছ যেন খোলা তলোয়ার ধারের উপর দিয়ে, রক্ত পড়বে স্রোতের মতো। পারবে তুমি এত কষ্ট করতে? যদি পারো, তাহলেই তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করি।'

'পারব, পারব', ক্ষীণস্বরে বললে রাজকন্যা। মনে পড়ল তার রাজপুত্রকে, এত দুঃখে তাকেই তো পাবে সে—আর পাবে অমর আত্মা।

ডাইনি বলতে লাগল,—'ভেবে দেখো—একবার মানুষ হয়েছ কি আর কোনো দিন জলকন্যা হতে পারবে না। পারবে না কখনো বোনদের কাছে ফিরতে, যেতে পারবে না বাপের বাড়ি। আর যদি এমন হয় যে রাজপুত্র তোমাকে এমন একান্ত ভালোবাসল না যে তোমার জন্যে সে বাপ-মাকে ছাড়তেও প্রস্তুত হতে পারে, যদি তুমি তার সমস্ত ভাবনায় আর প্রার্থনায় জড়িয়ে যেতে না-পারো, যদি-না পুরোহিতের মন্ত্রে তোমাদের বিয়ে হয়—তাহলে যে অমরতা তুমি চাও তা কখনো পাবে না, কখনো না। যে-রাতে রাজপুত্র অন্য এক জনকে বিয়ে করবে, সে-রাত্রি

ভোর হতেই তোমার মৃত্যু। দুঃখে তখন ভেঙে যাবে তোমার বুক, সমুদ্রের ফেনা হয়ে ভাসবে তুমি।'

মুমূর্ষুর মতো ম্লানমুখে বললে জলকন্যা,—'তবু, তবু আমি সাহস করব।'

'আর-একটা কথা। আমাকেও তোমার কিছু দিতে হবে তো—এত কাণ্ড করা কি সহজ কথা! সমুদ্রের তলায় তোমাদের সকলের কণ্ঠই মধুর, তার মধ্যে সবচেয়ে মধুর তোমার কণ্ঠ। তা-ই দিয়ে রাজপুত্রকে মুগ্ধ করবে ভেবেছ তো? কিন্তু তোমার এই কণ্ঠস্বরই আমি চাই। তোমার মধ্যে সবচেয়ে যেটা ভালো জিনিস, তা-ই এই মন্ত্র-পড়া জলের দাম ; নিজের রক্ত মিশিয়ে সেটা তৈরী করব আমি,—খোলা তলোয়ারের মতো ধার হবে তো তার সেই জন্যেই।'

জলকন্যা বললে,—'আমার কণ্ঠই যদি কেড়ে নিলে তাহলে আমার আর রইল কী? কী দিয়ে রাজপুত্রকে মুগ্ধ করব?'

'রইল তোমার অঙ্গের লাবণ্য, তোমার ভঙ্গির শ্রী, তোমার কথাভরা দৃষ্টি। এ-সব জিনিস নিয়ে মানুষের তরল চিত্তকে মুগ্ধ করা সহজই হবে। বেশ! সাহসে কুলোবে তো? জিভ বার করো—ওটা কেটে নিয়ে আমি নিজে রাখব। মন্ত্র-পড়া জলের এই দাম।'

'তা-ই হোক!' বললে রাজকন্যা।

ডাইনি তখন ফুটন্ত কড়াইতে সেই বিষ তৈরী করতে লাগল। আগে সে কড়াইটা ব্যাঙ-শামুক দিয়ে বেশ ভালো করে মুছে নিলে ; বললে,—'বিশুদ্ধভাবে সব করতে হয়।' তারপর তার বুকে একটু আঁচড় কাটল, কালো-কালো রক্ত গড়িয়ে পড়ল কড়াইতে আলকাতরার মতো। সঙ্গে-সঙ্গে অনেক রকম মশলা ঢালা হল। তারপর কড়াই থেকে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে ধোঁয়া উঠতে লাগল এমন বিকট বীভৎস মূর্তিতে যে দেখলে ভয়ে মূর্ছা যেতে হয়। তার ভিতর থেকে আবার কঁকানি-গোঙানির শব্দ আসছে—অনেকটা কুমিরের কান্নার মতো। অনেকক্ষণ পরে মন্ত্র-পড়া জল পরিষ্কার জলেরই মতো টলটলে দেখা গেল—তৈরী হয়েছে।

ডাইনি বললে জলকন্যাকে, 'তবে, এই নাও।' সঙ্গে-সঙ্গে তার জিভটা টেনে কেটে ফেলল। বোবা হয়ে গেল ছোট্ট জলকন্যা—না-পারে সে কথা বলতে, না-পারে গাইতে। যাবার সময় ডাইনি বলে দিলে, 'যদি ফণিমনসারা তোমাকে ধরতে আসে, এই জলের একটুখানি ছিটিয়ে দিয়ো—তাদের ডানাগুলি হাজার টুকরো হয়ে ছিঁড়ে যাবে।'

কিন্তু এ-উপদেশের কোনো দরকারই ছিল না। চকচকে শিশিটা তার হাতে তারার মতো ঝলমল করছে—তা-ই দেখেই ভয়ে ম'রে গেল ফণিমনসারা। পার হয়ে এল সে ভীষণ বন, পার হয়ে এল ডোবা, ছাড়িয়ে এল ফেনালো ঘূর্ণি।

এইবার সে পিতার প্রাসাদের দিকে তাকাল। নিবে গেছে সভার আলো, সবাই ঘুমিয়েছে। ভিতরে সে কেমন করে যাবে—গেলে তো কোনো কথাই বলতে পারবে

না! শেষবারের মতো ছেড়ে যেতে হচ্ছে এই বাড়ি—কষ্টে তার বুক প্রায় গেল ভেঙে। লুকিয়ে সে গেল বাগানে, প্রতি বোনের কুঞ্জ থেকে একটি করে ফুল নিলে ছিঁড়ে নিজেরই হাতে, চুমো খেল অনেক বার ; তারপর ঘন-নীল জলের ভিতর দিয়ে ভেসে উঠল সে, উপরের পৃথিবীতে।

তখনো সূর্য ওঠেনি। রাজপুত্রের প্রাসাদে পৌঁছিয়ে পরিচিত শাদা সিঁড়ি দিয়ে সে উঠে এল। আকাশে তখনো চাঁদ জ্বলছে, ছোট্ট জলকন্যা শিশিতে ভরা মন্ত্র-পড়া জল ঢেলে দিলে গলায়। ধারালো ছুরির মতো সেটা যেন তার ভিতরটাকে ছিঁড়ে দিয়ে গেল, মূর্ছিত হয়ে পড়ল সে। সূর্য ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে জাগল সে ; তার সমস্ত শরীর অসহ্য যন্ত্রণায় পুড়ে যাচ্ছে। যাক, পুড়ে যাক! তবু তো সে পেল তার এত আরাধনার ফল, দেখতে পেল অপরূপ রাজপুত্রকে ঠিক তার সামনে, কয়লার মতো কালো চোখ মেলে তারই দিকে তাকিয়ে লজ্জা পেয়ে নিজের চোখ সে নামিয়ে নিলে। এ কী! কোথায় তার মাছের মতো ল্যাজ? কোমল মসৃণ দুটি পা নেমে এসেছে যে! কিন্তু কোনো আবরণ নেই তার ; বৃথাই সে চেষ্টা করলে তার লম্বা ঘন চুল দিয়ে নিজেকে ঢাকতে।

রাজপুত্র জিগেস করলে সে কে, কী করেই-বা এখানে এল। উত্তরে সে তার উজ্জ্বল নীল চোখ দুটো বড়ো করে মেলে তাকাল, একটু হাসল—হায়, সে তো কথা বলতে পারে না! রাজপুত্র তাকে হাতে ধরে প্রাসাদের ভিতরে নিয়ে গেল। ডাইনি ঠিকই বলেছিল, তার এমন লাগল যেন খোলা তলোয়ারের ধারের উপর দিয়ে হাঁটছে সে, কিন্তু সে-কষ্টটা অনায়াসেই সহ্য করল, এগিয়ে গেল সে দখিন হাওয়ার মতো হালকা পায়ে ; যে দেখল তাকে সে-ই অবাক হল তার লঘু লীলার লাবণ্য দেখে।

প্রাসাদে ঢুকল সে, তার জন্যে আনা হল রেশমের আর মসলিনের বাহারে কাপড় ; সেখানে যারা থাকে, তার মতো সুন্দর কেউ নয়—কিন্তু সে না-পারে কথা বলতে, না-পারে গাইতে। রাজা-রানী আর রাজপুত্রের সামনে রোজ গান করে কয়েক জন দাসী, তাদের রেশমী কাপড়ে সোনালি বুটি তোলা ; তাদের মধ্যে এক জনের পরিষ্কার সুন্দর গলা শুনে রাজপুত্র খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠলেন। তাতে জলকন্যার মনে বড়ো কষ্ট হল : সে তো জানে এর চেয়ে ঢের বেশি সুন্দর ছিল তার গান! সে ভাবল, 'হায়রে, তার জন্যে যে আমি আমার এমন কণ্ঠস্বর চিরকালের মতো খুইয়ে বসেছি তা তো সে জানেই না!'

দাসীরা নাচতে শুরু করল। তখন উঠল আমাদের জলকন্যা ; লীলায়িত শুভ্র দুই বাহু বাড়িয়ে দিয়ে মৃদুভঙ্গিতে যেন হাওয়ায় সে ভেসে বেড়াতে লাগল। প্রতিটি ভঙ্গিতে ফুটে উঠল তার অঙ্গের নিখুঁত লাবণ্যের ছন্দ ; তার উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টিতে যে-কথা ঝলমল করে উঠল তা দাসীদের গানের চাইতে অনেক নিবিড় হয়ে মর্মে গিয়ে বাজল।

সকলেই মুগ্ধ হল। সবচেয়ে মুগ্ধ হল রাজপুত্র। সে তাকে ডাকলে, 'আমার কুড়িয়ে-পাওয়া লক্ষ্মী!' বারবার নাচলো সে, যদিও প্রতিটি পা ফেলতে অসহ্য যন্ত্রণা হল তার। রাজপুত্র বলে দিলে সে সব সময় তার সঙ্গে-সঙ্গে থাকবে ; তারই পাশের ঘরে মখমলের বালিশে মসলিনের বিছানা পাতা হল জলকন্যার।

রাজপুত্র তাকে পুরুষের পোশাক তৈরী করিয়ে দিলেন ; ঘোড়ায় চড়ে সে যখন বেরোবে এই কুড়িয়ে-পাওয়াও যাবে তার সঙ্গে। একসঙ্গে কত সুগন্ধী বনে তারা বেড়াল, সবুজ ডালপালা ছুঁয়ে-ছুঁয়ে গেল কাঁধ, নতুন পাতার বেড়ে লুকোন পাখিদের গানের জলসায় কী ফুর্তি! উঠল জলকন্যা তার সঙ্গে খাড়া পাহাড়ে, নরম পা ফেটে রক্ত বেরুল, অনুচরেরা ছুটে এল হাঁ-হাঁ করে। কিন্তু মুচকি একটু হেসে সে উঠল রাজপুত্রের সঙ্গে আরো উঁচুতে ; সেখানে দেখা যায় মেঘেরা পায়ের নিচে হেসে-খেলে গড়াগড়ি যাচ্ছে ; ছুটছে এ-ওর পিছনে, যেন একঝাঁক পাখি দেশান্তরে চলেছে উড়ে।

রাত্রে, প্রাসাদের সবাই যখন ঘুমে বিভোর, রাজকন্যা পাথরের সিঁড়ি দিয়ে আস্তে নেমে এসে জলে পা ডুবিয়ে বসে থাকে ; তখন তার মনে পড়ে জলের নিচে তার প্রিয়জনদের।

এক রাত্রে, তখন সে সিঁড়িতে বসে পা ধুচ্ছে, তার বোনেরা সাঁতরে এল সেখানটায় একসঙ্গে, হাতে হাত ধরে, গান গাইতে-গাইতে। কী করুণ সে-গান! সে ডাকলে তাদের ; বোনেরা তাকে দেখেই চিনতে পারলে ; সে চলে আসায় তাদের বাড়িতে কত দুঃখ সে-কথা তাকে না-বলে পারলে না। এর পর থেকে বোনেরা রোজ রাত্রেই আসে ; এক বার সঙ্গে করে বুড়ি ঠানদিকেই নিয়ে এসেছিল—অনেক দিন জলের উপরকার দেশটি দেখেন নি তিনি। এক দিন সাগর-রাজাও এলেন, মাথায় তাঁর সোনার মুকুট ; কিন্তু এঁরা দু' জন ডাঙার খুব কাছে ভিড়তে সাহস পেলেন না, মেয়ের সঙ্গে তাই কোনো কথাই বলা হল না।

এদিকে ছোট্ট জলকন্যাটি ক্রমেই রাজপুত্রের বেশি প্রিয় হয়ে উঠছে। কিন্তু তার কাছে সে কুড়িয়ে-পাওয়া লক্ষ্মীই, তার বেশি কিছু নয় সে ; ফুটফুটে মিষ্টি খুকুমণি—তাকে বিয়ে করবার কথা তার মাথায়ই এল না কখনো। কিন্তু বিয়ে না-করলে কী করে সে পাবে অমর আত্মা? বিয়ে তাকে করতেই হবে—নয়তো ফেনা হয়ে যাবে সে, ছুটতে হবে তাকে চিরকাল, সমুদ্রের অশ্রান্ত ঢেউয়ে-ঢেউয়ে ধাক্কা সয়ে।

রাজপুত্র যখন তাকে বুকে নিয়ে আদর করেন, তার চোখ যেন জিগেস করে,—'তুমি কি আর-সকলের চেয়ে বেশি ভালবাস না আমাকে?'

রাজপুত্র বলেন,—'সবচেয়ে তোমাকেই তো ভালবাসি—তোমার মতো ভালো আর কে? তুমিও তো আমাকে কম ভালবাস না ; এক বার একটি মেয়েকে পলকে দেখেছিলাম, আর বোধহয় কখনোই দেখব না—তুমি অনেকটা তার মতোও। ছিলেম এক বার এক জাহাজে, ডুবল জাহাজ, ঢেউয়ের ঘা খেয়ে-খেয়ে ঠেকলাম

গিয়ে তীরে এক মন্দিরের ধারে, সেখানে একদল মেয়ে পুজোআর্চা নিয়ে আছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট্টটি কুড়িয়ে পেল আমাকে, প্রাণ বাঁচাল আমার। এক বার শুধু তাকে আমি দেখেছিলাম, কিন্তু তার ছবি আমার স্মৃতিতে আঁকা হয়ে গেছে, তাকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসতে পারব না। কিন্তু সে তো দেবতার সেবিকা, কী করে পাব তাকে? তুমি তার মতোই দেখতে, সেই জন্যেই বুঝি এসেছ আমাকে সান্ত্বনা দিতে। আমাকে কখনো ছেড়ে যেয়ো না।'

জলকন্যা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবলে, 'হায় রে, সে তো জানে না আমিই তার প্রাণ বাঁচিয়েছিলাম! দুরন্ত ঢেউগুলোর উপর দিয়ে তাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলাম বনের মধ্যে সেই মন্দিরের ধারে ; বসেছিলাম পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে—এক্ষুনি কেউ এসে পড়বে, এই আশায়। তারপর দেখলাম সেই সুন্দর মেয়েটিকে এগিয়ে আসতে—তাকেই সে ভালবাসে আমার চেয়ে বেশি!' সে আর-এক বার দীর্ঘশ্বাস ফেলল, জলকন্যা তো কাঁদতে পারে না! 'সে-মেয়ে নাকি দেবতার সেবিকা, মন্দির ছেড়ে কখনো আসতে পারবে না, আর তো তাদের দেখা হবে না! আমি আছি সব সময় তার সঙ্গে-সঙ্গে, রোজ তাকে দেখি ; আমি তাকে ভালবাসব, সমস্ত জীবনটা উৎসর্গ করব তাকেই।'

এদিকে রাজ-অমাত্যরা বলাবলি করে,—'প্রতিবেশী রাজার মেয়ের সঙ্গে আমাদের রাজপুত্রের তো বিয়ে! মস্ত জাহাজ সাজানো হচ্ছে সেই জন্যেই। সকলকে জানানো হয়েছে তিনি দেশভ্রমণে বেরোচ্ছেন, আসলে কিন্তু যাচ্ছেন রাজকন্যাকে আনতে, লোকজন সৈন্য-সামন্ত বিস্তর যাবে সঙ্গে।' এ-সব কথা শুনে জলকন্যা মুচকি হাসে ; রাজপুত্রের মনের আসল ভাবখানা তার চেয়ে ভালো কে জানে!

একদিন রাজপুত্র তাকে বললেন,—'আমাকে তো যেতে হচ্ছে। সুন্দরী রাজকন্যাকে দেখতে যেতেই হবে আমাকে, আমার মা-বাবার ইচ্ছে তা-ই। কিন্তু সেই মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে আনতেই হবে—এমন কোনো জোর তাঁরা করবেন না। অবিশ্যি আমার পক্ষে তাকে ভালবাসাও অসম্ভব ; মন্দিরের সেই মেয়ের মতো তুমি দেখতে বলে কি আর সে-ও তেমন হবে! যদি বিয়ে করতেই হয়, বরং তোমাকেই করব—আমার কুড়িয়ে-পাওয়া লক্ষ্মী, মুখে কথা নেই, চোখ-ভরা কথা!' এই বলে সে তার চুলগুলো আঙুলে জড়িয়ে একটু আদর করলে ; সঙ্গে-সঙ্গে জলকন্যার মন মানুষের সার্থকতা আর অমর আনন্দের মধুর স্বপ্নে দোলা দিয়ে উঠল।

জমকালো জাহাজে চড়ে প্রতিবেশী রাজার দেশে যেদিন যাত্রা, সেদিন রাজপুত্র বললে জলকন্যাকে, জাহাজে তার পাশে দাঁড়িয়ে,— 'লক্ষ্মী খুকু, সমুদ্রে তোমার ভয় করে না তো?' তারপর বললে, 'ঝড়ে সমুদ্র কেমন পাগল হয়ে ওঠে ; জলের

নিচে থাকে কত অদ্ভুত মাছ, কত আশ্চর্য জিনিস যা ডুবুরিরা দেখে।' জলকন্যা একটু হাসল এ-সব কথা শুনে,—সমুদ্রের তলায় কী আছে না-আছে তা কি তার চেয়ে ভালো জানে পৃথিবীর কোনো মানুষ।

রাত্রে চাঁদ উঠেছে আকাশে, জাহাজের সবাই ঘুমিয়ে, সমুদ্রের ভিতরে তাকিয়ে সে বসে রইল। জাহাজ চলেছে সমুদ্রকে চিরে, জল উঠছে ফেনিয়ে ; সেদিকে তাকাতে-তাকাতে তার মনে হল সে যেন তার বাবার প্রাসাদ দেখতে পাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছে তার ঠানদির রুপোলি মুকুট। তারপর দেখল তার বোনেরা জল থেকে উঠে আসছে, ভারি ম্লান তাদের মুখ, হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে তার দিকে। সে হাসল তাদের দিকে তাকিয়ে ; সে যেমনটি চেয়েছিল ঠিক তেমনটি সব ঘটছে এই কথা তাদের বলতে যাবে, এমন সময় সেখানে এসে পড়ল একজন খালাসি। তাকে দেখেই বোনেরা হঠাৎ এমন ডুব দিলে জলের মধ্যে যে খালাসি ছোকরা মনে করল জলের উপর সে শুধু ফেনাই দেখছিল—আর-কিছু নয়।

পরের দিন সকালে জাহাজ ঢুকল রাজধানীর বন্দরে। বাজল শঙ্খ, বাজল জয়ঢাক, সৈন্যেরা মিছিল করে গেল শহরের ভিতর দিয়ে, উড়ল নিশেন, চলল ঝলসানো সঙিন। রোজই নতুন-নতুন আমোদ, নাচ-গান, খাওয়াদাওয়া লেগেই আছে। কিন্তু রাজকন্যা তখন সেখানে নেই, তাঁকে পাঠানো হয়েছে দূরের দেশে লেখাপড়া শিখতে, রাজবংশের সব রকম গুণপনা সেখানে তিনি আয়ত্ত করছেন। কিছুদিন পর তিনি ফিরলেন দেশে।

এই আশ্চর্য রাজকন্যাকে দেখতে ছোট্ট জলকন্যা কিছু উৎসুকই ছিল—যখন দেখল স্বীকার করতে বাধ্য হল—সুন্দরী বটে, এত সুন্দর কোনো মেয়ে সে কখনো দেখে নি!

রাজকন্যার গায়ের চামড়া এমন শাদা আর নরম যে তার ভিতর দিয়ে নীল শিরাগুলো যেন স্পষ্ট ফুটে বেরিয়েছে ; বাঁকা ভুরুর নিচে ঝকঝক করছে কালো এক জোড়া চোখ।

'এ যে সেই!' রাজপুত্র বলে উঠল তাকে দেখেই। 'এ-ই তো আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিল—মড়ার মতো যখন পড়ে ছিলাম সমুদ্রের ধারে!' সলজ্জ বধূকে সে নিলে কাছে টেনে। তারপর বোবা কুড়িয়ে পাওয়া জলকন্যাকে বললে,—'আজ আমার সুখের সীমা নেই! যা আমি আশা করতে সাহস পাই নি তা-ই হয়েছে। আমার সুখে তুমিও কি আজ সুখী হবে না?—আশেপাশের সকলের মধ্যে তুমিই তো আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাস!'

বোবা জলকন্যা দুঃখে এক বার রাজপুত্রের হাত চেপে ধরল। এখনই কেন ভেঙে যাচ্ছে তার বুক ; যদিও সেই বিয়ের রাত এখনো ভোর হয় নি,—তার মরণের দিন!

আবার মন্দিরে বাজল শঙ্খ, দূতেরা বেরুল শহরের পথে-পথে আসন্ন বিবাহের ঘোষণা নিয়ে। বেদীতে জ্বলল রুপোর প্রদীপে সুগন্ধি আগুন, পুরোহিত সোনার ধূপতিতে ধুনো দিলে, বর-বধূ হাতে হাত রাখল, উচ্চারিত হল বিবাহের পবিত্র মন্ত্র।

ছোট্ট জলকন্যা পরেছে আজ রেশমের আর সোনার কাপড়, রাজকন্যার ওড়নার আঁচল ধরে পিছনে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু না দেখছিল তার চোখ সেই শুভ অনুষ্ঠান, না শুনছিল সে গুরুগম্ভীর বিবাহের বাজনা ; শুধু সে ভাবছিল তার আসন্ন অবসানের কথা ; তার মনে হল পৃথিবী ও স্বর্গ দুই-ই সে হারাল।

সেই সন্ধ্যাতেই বর-বধূ জাহাজে গেল ফিরে। গর্জাল কামান, হাওয়ায় উড়ল নিশেন, আর জাহাজের খোলা ছাদে সোনালি কাপড়ের অপরূপ শামিয়ানার তলায় কিংখাবের নরম জাজিম পাতা হল—বর-বধূ রাত্রে সেখানে শোবেন। অনুকূল হাওয়া উঠল ; নীল জলের উপর দিয়ে জাহাজ হালকা ছন্দে চলল দুলে-দুলে।

অন্ধকার হবার সঙ্গে-সঙ্গেই রাশি রাশি রঙিন আলো জ্বলে উঠল, ছাদের উপর শুরু হল নাচ। জীবনে প্রথমবার সমুদ্র থেকে মাথা তুলে যে-দৃশ্য সে দেখেছিল জলকন্যার তা মনে পড়ে গেল।

এ-দৃশ্যও তেমনি জমকালো—তাকেও যোগ দিতে হল নাচে, জাহাজের তক্তার উপর পাখির হালকা পায়ে সে ঘুরে বেড়াতে লাগল। মুগ্ধ হয়ে গেল সবাই, এত সুন্দর সে কখনো নাচে নি। ভীষণ লাগল তার ছোটো দুটি পায়ে ; কিন্তু সে-কষ্ট যেন তার আজ লাগলই না—অনেক বেশি কষ্ট যে তার মনে।

আজকের পরে সে আর তাকে দেখবে না—যার জন্য সে ছেড়ে এসেছে বাড়ি-ঘর, বাপ-মা, হারিয়েছে তার অপরূপ কণ্ঠস্বর, রোজ সয়েছে অসহ্য যন্ত্রণা—আর সেই মানুষটি একফোঁটা সন্দেহও করে না তার জন্যেই তো সে এত সব করেছে! আজই শেষ। এর পরে সে আর নিঃশ্বাসে সেই বাতাস টানবে না যে-বাতাসে তার প্রিয়তমের জীবন ; আর দেখবে না ঘন-নীল সমুদ্র, তারায় ছাওয়া আকাশ। আসছে চিরন্তন রাত্রি—সেখানে আর-কোনো ভাবনা নেই, কোনো স্বপ্ন নেই। জাহাজের উপর বয়ে চলেছে ফুর্তির স্রোত ; সে-ও দুপুর রাত পর্যন্ত সকলের সঙ্গে হাসল, নাচল—মনের মধ্যে তার নিঃশেষ হয়ে-যাওয়া মৃত্যুর ভাবনা। তারপর রাজপুত্র গেল তার সুন্দরী বধূকে নিয়ে জমকালো শামিয়ানার নিচে বিশ্রাম করতে।

এখন সব চুপচাপ ; হাল ধরে একা একজন মাল্লা দাঁড়িয়ে। জাহাজের সিঁড়িতে শাদা হাত দু'টি হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পুবের আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল সে। কখন ভোর হবে? সূর্যের প্রথম আলোর রেখাই তো তার মৃত্যুর তলোয়ার! তার বোনেরা জল থেকে এল উঠে, মৃত্যুর মতো ম্লান তাদের মুখ ; এত সুন্দর লম্বা চুল তাদের ছিল, ঘাড়ের উপর দিয়ে ফুরফুর করে উড়ত—এখন আর নেই।

কী হল চুল?

'চুল দিয়েছি আমরা ডাইনিকে', তারা বললে। 'যাতে তোমাকে মরতে না-হয়, যাতে সে তোমার জন্যে কিছু করে। ডাইনি দিয়েছে এই ছুরিটা তোমার জন্যে, এই নাও। সূর্য ওঠবার আগেই এটা দেবে রাজপুত্রের বুকে বসিয়ে ; যেই তার গরম রক্তের ফোঁটা তোমার পায়ের উপর পড়বে, তোমার ল্যাজ আবার হয়ে যাবে। আবার হবে তুমি জলকন্যা, সমুদ্রের ফেনা হয়ে যাবার আগে বেঁচে নেবে পুরো তিন শো বছর। শিগগির করো, শিগ্‌গির! সূর্যোদয়ের আগে হয় সে মরবে, কি মরবে তুমি।'

'বুড়ো ঠানদি আমাদের রোজই কাঁদে তোমার জন্যে, কাঁদতে-কাঁদতে চোখ অন্ধ হয়ে গেছে তাঁর, মাথার চুল সব পড়ে গেছে—যেমন গেছে আমাদের চুল ডাইনির কাঁচিতে। মারো, মারো রাজপুত্রকে, এসো আমাদের কাছে! এক্ষুনি! দেখছো না পুবের আকাশে গোলাপী আভা, সূর্য উঠল বলে! সূর্য উঠলেই তো তোমার শেষ!

এই বলে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে তারা গেল মিলিয়ে।

বর-বধূ যেখানে শুয়ে, ছোট্ট জলকন্যা তার সোনালি পরদা সরিয়ে ঢুকল ; তাকিয়ে দেখল রাজপুত্রকে, চুমু খেল তার কপালে ; তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল, আলো প্রতি মুহূর্তেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। রাজপুত্র ঘুমের মধ্যে অস্ফুট-স্বরে কী বললে—তার বধূর নাম ; তার স্বপ্ন সে দেখেছে, শুধু তারই—এদিকে জলকন্যার হাতে কাঁপছে সেই সর্বনেশে ছুরি।

হঠাৎ সে দূরে সমুদ্রে ফেলে দিলে মৃত্যুর সেই ধারালো জিহ্বা ; জ্বলন্ত লাল ঢেউগুলো লাফিয়ে উঠল সবদিকে ; ঢেউয়ের উপর দিয়ে নেচে চলল যেন এক পাগলী মেয়ে, মুকুট তার টাটকা রক্তে ছোপানো। তার প্রিয়তম রাজপুত্রের দিকে শেষবার যে-চোখ মেলে জলকন্যা তাকাল তা ক্রমেই স্থির, ঘোলাটে হয়ে এল ; তারপর সে জাহাজ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল সমুদ্রে, নিশ্চিত বুঝতে পারলে যে তার শরীর আস্তে আস্তে ফেনা হয়ে গলে যাচ্ছে।

জলের বিছানা থেকে উঠল সূর্য ; এমন কোমল উষ্ণ হয়ে আলোর পাপড়িগুলো পড়ল তার সারা গায়ে যে জলকন্যা প্রায় বুঝতেই পারলে না যে সে মরছে। এখনো সে দেখছে জ্যোতির্ময় সূর্যকে, তার মাথার উপর ভাসছে হাজার হাজার স্বচ্ছ সুন্দর মূর্তি ; এখনো তার চোখে ভেসে উঠছে জাহাজের শাদা পাল, অরুণ ঊষার আলোর নাচ। মাথার উপরে সেই অশরীরী জীবদের কণ্ঠস্বরে ঝরে পড়ছে সুর—তা, এমনই মধুর, এমনই কোমল যে মানুষের কানে সে শব্দ ধরাই পড়ে না, যেমন ধরা পড়ে না মানুষের চোখে তাদের মূর্তি। তাকে ঘিরে তারা ঘুরে ঘুরে উড়ে বেড়াল,—যদিও পাখা তাদের নেই—নিজেদেরই লঘুতা ইচ্ছার বেগে তাদের ঠেলে উড়িয়ে নিয়ে যায়। শেষটায় জলকন্যা দেখলে যে তার শরীরও ওদের মতো হালকা হয়ে যাচ্ছে ; মনে হল কে যেন তাকে সমুদ্রের ফেনা থেকে আস্তে আস্তে ঠেলে তুলছে উপরের দিকে।

'কোথায় আমি? যাচ্ছি কোথায়?' সে জিগেস করলে। তার কণ্ঠস্বর বেরুল, শোনাল ঠিক ঐ আকাশ-কন্যাদের মতো। সে শব্দ অলৌকিক, শান্ত, স্নিগ্ধ। তার মধুর কোমলতা অন্তরের গহনতলে নিবিড় হয়ে ঝরে পড়ল।

আকাশ-কন্যাদের এক জন বলল,—'তুমি যে আমাদের মধ্যে এসে পড়েছ! আজ হতে তুমিও যে আকাশ-কন্যা। জলকন্যার অমর আত্মা নেই ; কোনো মানুষের ভালবাসা পেলে তার আত্মা অমর হয়ে ওঠে। তার অনন্ত জীবন অপরের উপর নির্ভর করে।'

'অমর আত্মা আকাশ-কন্যাদেরও নেই ; আমরা তা অর্জন করি নিজেদের ভালো কাজের জোরে। আমরা উড়ে যাই গরম দেশে ; যেখানে পৃথিবীর ছেলেমেয়েরা বিষাক্ত হাওয়ার ঝাপটায় ধুঁকছে। আমাদের স্নিগ্ধ নিঃশ্বাসে হাওয়ার বিষ চলে যায়, তাদের প্রাণ বাঁচে। বাতাসের মধ্যে আমরা ছড়িয়ে যাই প্রাণের শীতল হাওয়া, তাকে সুরভিত করে তুলি ফুলের মিষ্টি গন্ধে ; এমনি করে সমস্ত পৃথিবীতে বিলিয়ে যাই স্বাস্থ্য আর আনন্দ। তিন শো বছর ধরে এমনি সুকীর্তির জোরে আমরা অমরতা লাভ করি—মানুষের চিরন্তন সার্থকতার অংশীদার হই। আর তুমি ছোট্ট জলকন্যা—তুমি তোমার প্রাণপণ করে রাজপুত্রকে বাঁচিয়েছ ; হৃদয়ের প্রেরণায় মানুষের প্রেমের জন্য এত করেছ ; এত দুঃখ পেলে আমাদের মতো মানুষের সেবায়—এখন তুমি অপরূপ দেহ নিয়ে উঠে এসেছ পরীদের আকাশে ; এখন তিন শো বছর ধরে সুকাজ করলে অমর আত্মা লাভ করতে পারবে।'

ছোট্ট জলকন্যা সূর্যের দিকে বাড়িয়ে দিলে তার আলোক-উজ্জ্বল দৃষ্টি, তার সরল কোমল দুটো স্বচ্ছ দীঘল বাহু ; তারপর—জীবনে প্রথম বার জলে ভিজে উঠল তার চোখ।

এদিকে জাহাজে সবাই উঠেছে জেগে, আবার শুরু হয়েছে উৎসব। সে দেখল রাজপুত্র নববধূকে নিয়ে বসে আছে ; তাকে খুঁজে না-পেয়ে তাদের মন বড়ো খারাপ ; ম্লান মুখে তারা তাকিয়ে আছে নিচুমুখে ঢেউয়ের ফেনার দিকে—যেন তারা জানে ঐ সমুদ্রের ঢেউয়ের মাঝে ঝাঁপ দিয়েছে সে। অদৃশ্য হয়ে জলকন্যা রাজপুত্রের কপালে চুমু দিলে, হাসল তার দিকে তাকিয়ে ; তারপর আকাশ-কন্যাদের সঙ্গে উড়ে মিলিয়ে গেল জাহাজের উপর দিয়ে ভেসে-যাওয়া গোলাপী মেঘের মধ্যে, তাদের সঙ্গে-সঙ্গে ভেসে গেল দিগন্ত ছাড়িয়ে।

'তিন শো বছর পরে আমরাও যাব স্বর্গরাজ্যে', সে বললে।

এক জন কানে-কানে বললে, 'আরো আগেই যেতে পারি। যে-সব মানুষের বাড়িতে ছোটো ছেলেমেয়ে আছে, তাদের ভিতর অদৃশ্য হয়ে আমরা উড়ে যাই ; আর যখনই আমরা দেখতে পাই একটি ভালো ছেলে যে তার মা-বাবার বুক, মুখ উজ্জ্বল করেছে, তাঁদের স্নেহের পুতুল হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখনই ঈশ্বর আমাদের এই প্রতীক্ষার সময়টা কমিয়ে দেন।'

'শিশুরা কেউ জানে না যে আমরা ঘরে-ঘরে উড়ে বেড়াচ্ছি ; জানে না, তাদের ভালো কাজে খুশি হয়ে আমরা একবার হাসলেই তিন শো থেকে একটা বছর কমে যায়। কিন্তু যখনই আমরা দেখি বদমেজাজি দুষ্টু ছেলে, মনের দুঃখে আমরা কাঁদি, আর আমাদের প্রতি অশ্রুবিন্দু আমাদের পরীক্ষার সময় একদিন করে বাড়িয়ে দেয়।'

হান্স আণ্ডেরসেন

য়োরোপের ম্যাপের উত্তর-পশ্চিম কোণে তাকালে তোমরা পাশাপাশি তিনটি দেশ দেখতে পাবে : নরোয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্ক। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিশু মায়াবী হান্স ক্রিস্টিয়ান আণ্ডেরসেন-এর (Hans Christian Andersen) জন্ম হয় ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে ডেনমার্কের ওডেন্সে শহরে।

তাঁর বাবা ছিলেন মুচি আর মা ছিলেন ধোপানি। বাড়িতে একটিমাত্র ঘর, গরিব অবস্থা, তবু শৈশব তাঁর সুখেই কেটেছিল। বড়ো হয়ে তাঁর সখ হল অভিনেতা হবেন। গেলেন রাজধানী কোবেনহাভ্‌ন্‌-এ (ইংরেজিতে বলে কোপেনহেগেন), কিন্তু কিছুদিন পরেই বোঝা গেল তাঁর আসল প্রতিভা হচ্ছে লেখার দিকে। রাশি-রাশি কবিতা, উপন্যাস ও নাটক লিখেছিলেন তিনি, সে-সব আজকাল আর বিশেষ কেউ পড়ে না। কিন্তু ছোটোদের জন্য যে-সব গল্প তিনি লিখেছিলেন, তা পৃথিবীর সব দেশে ছোটোবড়ো সবাই আজও পড়ে মুগ্ধ হচ্ছে, এবং চিরকালই হবে। এদের জোরে তিনি আজ পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত লোকেদের একজন।

হান্স আণ্ডেরসেনের এই গল্পগুলির সত্যি কোনো তুলনা নেই। নামে এটা 'রূপকথা', কিন্তু জর্মানির গ্রিম্‌-ভাইয়েদের 'রূপকথা'র মতো এরা নিছক ঠাকুমা-ঠানদির ঝুলি থেকে বেরিয়ে আসে নি। সে-ধরনের গল্প কমই লিখেছেন তিনি, বেশির ভাগই আনকোরা তাঁর নিজের তৈরী। অদ্ভুতের সঙ্গে বাস্তব, তামাশার সঙ্গে কান্না, বিদ্রূপের সঙ্গে বেদনা মিশিয়ে এমন রংবেরঙের আশ্চর্য খামখেয়ালি গল্প আর কেউ লেখেন নি। আণ্ডেরসেন বলতেন : 'গল্পগুলি এসে আমার কপালে টোকা মেরে বলে—"এই যে! এই যে!' যে-কোনো তুচ্ছ জিনিস নিয়ে গল্প বানাবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তাঁর। একবার এক বন্ধু তাঁকে ঠাট্টা করে বলেন : 'ভাঙা পুতুলের গল্প লিখতে পারো?' অমনি তৈরী হল বিখ্যাত গল্প 'The Constant Tin Soldier' ('টুনকি ও রাজকন্যা')।

মানুষের মন খুব ভালো করেই জানতেন তিনি। কিন্তু শুধু মানুষ নিয়েই তাঁর গল্পের কারবার নয় ; পশু, পাখি, গাছ, ফুল আর জলকন্যা, ফুলের পরী, ডাইনি বুড়ি, মানুষের ছায়া, সবই তাঁর গল্পে ঠিক মানুষের মতোই জীবন্ত—একটা ভাঙা পুতুল, এমনকি সামান্য একটা ছুঁচেও প্রাণ ফোটাতে পারতেন এই জাদুকর।

এই গল্পগুলি বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের দেশে ও সারা য়োরোপে আণ্ডেরসেনের নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। কত ছেলেমেয়ের কাছ থেকে অসংখ্য চিঠি তিনি পেতেন। তাঁর মৃত্যু হয়েছে আজ ষাট বছর হল ; কিন্তু তাঁর গল্পগুলির আদর পৃথিবীতে বেড়েই চলেছে।

ওডেন্সে-তে যে-বাড়িতে তিনি জন্মেছিলেন, সেটি এখন এক ম্যুজিয়মের বাসা, তাঁর অনেক স্মৃতিচিহ্ন সাজানো আছে সেখানে। কোপেনহেগেনে সমুদ্রের ধারে বিশাল পার্কে আছে তাঁর ছোট্ট জলকন্যার মূর্তি, সেখানে ১৯৩০ সালের ২রা এপ্রিল তারিখে হাজার-হাজার ছেলেমেয়ে জড়ো হয়ে তাঁর স্মৃতিকে সম্মান জানিয়েছিলেন। এই সেদিন তাঁর গল্পগুলির প্রথম প্রকাশের শতবার্ষিকীতে ডেনমার্কে তাঁর নামে বিশেষ ডাকটিকিট বেরিয়েছে।

আণ্ডেরসেনের গল্পগুলির তর্জমা না-হয়েছে এমন সভ্য ভাষা বোধহয় নেই। আজ বাংলায় এই গল্পগুলির তর্জমা করতে পেরে আমি গর্ববোধ করছি।

এই তর্জমার কাজটা আমার পক্ষে যত সুখের হয়েছিল, সহজ ততটা হয় নি। এগুলো অনুবাদের অনুবাদ, সে-মুশকিল তো আছেই। তাছাড়া, সেই শীতের দেশের গল্পের সমস্ত রস ও সৌরভ গরমের দেশের ভাষায় অনেক সময়ই পৌঁছিয়ে দেয়া শক্ত। কিন্তু আমি আমাদের দেশের আবহাওয়ার সঙ্গে মেলাবার কোনো চেষ্টা করি নি, বরং না-মেলাবার চেষ্টা করেছি। বরফে ঢাকা দেশের শীতে-কাঁপা গল্প বাংলা পাড়াগাঁয়ের আলো-হাওয়ায় টেনে আনলে কারোরই কিছু লাভ হত না। নামগুলো সব মূলেরই আছে, যেখানে বদলেছি সেখানে বদলালে কিছু এসে যায় না। গল্পগুলিকে ছেলেমেয়েরা সম্পূর্ণ বিদেশী বলেই জানুক, এই ছিল আমার উদ্দেশ্য। তাদের পরিচয় হোক হান্স আণ্ডেরসেনেরই সঙ্গে।

আণ্ডেরসেনের সব গল্পই ভালো, সবচেয়ে ভালো যেগুলোকে মনে করি তা থেকেও বেছে-বেছে তর্জমা করতে হল। শ্রেষ্ঠ গল্প কিছু কিছু বাদ পড়েছে, তাছাড়া তাঁর অজস্র গল্পের তুলনায় এই বইয়ের পরিমাণও ক্ষীণ। তবু আমার বিশ্বাস, এই এগারোটি গল্প পড়ে আণ্ডেরসেনের আশ্চর্য প্রতিভার গভীরতা ও বৈচিত্র্য দু'য়েরই পরিচয় পাওয়া যাবে।

বুদ্ধদেব বসু

কলকাতা
অক্টোবর, ১৯৩৬

নতুন সংস্করণের ভূমিকা

এই সংস্করণে 'লাটিম ও বল' ও 'রাজকন্যা ও মটরশুঁটি' এই দুটি গল্প যোগ করা হলো— সব সুদ্ধু গল্প হল তেরোটি। 'লাটিম ও বল' ইতিপূর্বে আমার অন্য একটি বইতে ছাপা হয়েছিল।

বুদ্ধদেব বসু

কলকাতা
এপ্রিল, ১৯৬২

সেকায়েপ

সেকেন্ডারি এডুকেশান কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (SEQAEP) এর
পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য মুদ্রিত।

বিক্রির জন্য নয়